প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, 1950

প্রকাশক শ্রীসুবোধনাথ বাগচী
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
93 আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
5 চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

সূচী

পেনিসিলিন

স্ট্রেপটোমাইসিন

পরিশিষ্ট

মুখবন্ধ

পেনিসিলিনের আবিষ্কার ও ব্যবহারে যে অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর এসেছে তা বলাই বাহুল্য। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অসংখ্য রোগী এর ব্যবহারে রোগমুক্ত হয়েছে। মৃতপ্রায় অসংখ্য ব্যক্তি পুনর্জীবন পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই বস্তু এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল থাকা খুবই স্বাভাবিক। স্ট্রেপটোমাইসিনও সম্প্রতি পেনিসিলিনের মত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পুস্তিকায় প্রধানত এই দুটি ঔষধের কথাই অতিসংক্ষেপে বিবৃত করা হল। এ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিধি এত বিস্তৃত হয়েছে যে, একজনের পক্ষে সমস্তটা পড়া বা জানা কঠিন। একটি ছোট পুস্তিকায় এর সম্যক বর্ণনা মোটেই সম্ভবপর নয়। এই কারণে পেনিসিলিনের রাসায়নিক প্রকৃতি ও তার কৃত্রিম উৎপাদনের বিষয় জানবার জন্যে যে বিপুল চেষ্টা হয়েছে সে সম্বন্ধে উল্লেখও করা সম্ভব হল না। তা ছাড়া জীববিজ্ঞানে প্রচুর জ্ঞান না থাকলে এ বিষয়ে প্রবেশ করাও দুঃসাধ্য। এদুটি ছাড়া অন্য কয়েকটি জীবাণুশাসকের কথাও পেনিসিলিন অধ্যায়ে এবং পরিশিষ্টে উল্লেখ করা গেল।

আশা করি এই পুস্তিকা পাঠকের মনে এ বিষয় ভাল করে জানবার জন্য কৌতূহলের সৃষ্টি করবে।



পেনিসিলিন

ভূমিকা

অধিকাংশ প্রাণীই নিজেকে শক্রর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কতকগুলি বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। এমন কি চর্মচক্ষুর অগোচর অণু-প্রাণী এবং অণু-উদ্ভিদেরও এই ভাবে আত্মরক্ষা করার দরকার হয়। যেমন, দেখা যায় তারা (1) দ্রুত-বৃদ্ধির ফলে বাসোপযোগী স্থান বা চতুঃপার্শ্বস্থ খাদ্যভাণ্ডারকে শক্রর চেয়ে তাড়াতাড়ি দখল করে ফেলে; অথবা (2) তাদের শরীর থেকে নির্গত এক বা একাধিক নিঃস্রাবের সাহায্যে পোষক-মাধ্যমের অম্লত্ব, অস্‌মস চাপ, অথবা পৃষ্ঠবিততি এমনভাবে বদল করে দেয় যে তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জীবাণুর বাস অসম্ভব হয়ে পড়ে; কিংবা (3) তারা তাদের শরীর থেকে এমন বিষবস্তু নিঃসারণ করতে পারে, যা তাদের বৃদ্ধিকে আংশিক বা পূর্ণভাবে দমন করে; এমন কি এই বিষরস প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীর জীর্ণ করেও ফেলতে পারে। এই শেষোক্ত ক্রিয়াকে 'শাসক'-ক্রিয়া বলা যায়।

প্রায় 70 বৎসর আগে থেকেই এই ক্রিয়ার উদাহরণ বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। 1877 সালে সুবিখ্যাত ফরাসী রসায়নবিদ লুই পাস্তর প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর বৃদ্ধি বায়ুবাহিত অন্য কোন কোন

জীবাণুর ক্রিয়ায় হ্রাস পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, বহু রোগের জীবাণুযুক্ত পোষক-মাধ্যম (কাল্‌চার) মাটিতে পড়লে ভূমিবাসী অন্য জীবাণুর প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তাপের সাহায্যে মাটিকে জীবাণুমুক্ত করলে মাটির এই শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। 1905 সালে আমেরিকায় ডব্লু. ডি. ফ্রস্ট প্রমাণ করেন যে, ভূমিবাসী অনেক জীবাণু বহু রোগজীবাণুকে নষ্ট করতে পারে। তাঁর মতে এই কারণেই বালকবালিকারা সারাদিন ধূলামাটি নিয়ে খেলা করলেও বারবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় না। ঐ বৎসরই বৃটিশ জীবাণুবিদ এফ. ডব্লু. টর্‌ট-ও এই রকম ব্যাপার লক্ষ্য করেন। 1917 সালে ফরাসী ডাক্তার ডি. হেরেল কোন কোন ব্যাক্টিরিয়া উৎপাদন করে তাদের পোষক-মাধ্যম হতে তাদেরই বিনাশকারী অথচ বিষক্রিয়াহীন জীবাণু-জারক বস্তু (ব্যাক্টিরিওফাজ) তৈরি করেন। এই আবিষ্কারে কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসায় যুগান্তর ঘটে। 1927 সালে ইংরাজ ছত্রক-রসায়নবিদ রাইস্ট্রিক পেনিসিলিয়াম সিট্রিনাম নামক ছত্রক থেকে সিট্রিনিন প্রস্তুত করেন। এই বস্তুর যথেষ্ট জীবাণুশাসক-শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরে আরও শক্তিশালী অন্য বস্তু আবিষ্কারের ফলে এর আদর কমে যায়। এই সব আবিষ্কারের পরে অনেকের ধারণা হল যে, মানব-শরীরে রোগজীবাণু দমন করতে হলে জীবাণুনিঃসৃত শাসক-বস্তুর ব্যবহার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। গত শতাব্দীর

শেষভাগে নানা দেশে এই বিষয়ে বহু পরীক্ষাও করা হয়, কিন্তু এই সব চেষ্টা তখন পূর্ণভাবে সফল হয়নি। কারণ জীবাণুনিঃসৃত শাসক-বস্তুকে নির্দোষ অবস্থায় উদ্ধার করা তখনও সম্ভব হয়নি। জীবাণুযুক্ত মাটি বা শাসকযুক্ত অশোধিত পোষক-মাধ্যম (কাল্‌চার) নিয়েই পরীক্ষা চলছিল।

পেনিসিলিনের আবিষ্কার

1929 সালে ইংরাজ ব্যাক্টিরিয়াবিদ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ডিমের সারাংশ থেকে লাইসোজাইম নামক একটি রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করেন। কতকগুলি রোগ-জীবাণুর উপর এর যথেষ্ট শাসক-ক্রিয়া দেখা যায়, তবে একেও কাজে লাগানো সে-সময় সম্ভবপর হয়নি। এই বৎসরই কিন্তু ফ্লেমিং ঘটনাচক্রে এমন আর একটি বস্তু আবিষ্কার করলেন, যাতে জীবাণুশাস্ত্রে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে সাড়া পড়ে গেল। ফ্লেমিং সে সময় লণ্ডনে সেণ্ট মেরি হাসপাতালে কাজ করছিলেন। 'পেট্রি-ডিস' নামক কাচের চ্যাপ্টা বাটিতে জেলিজাতীয় আগার-মাধ্যমে তিনি স্ট্যাফাইলোককাস রোগজীবাণু বপন করে রেখেছিলেন সাধারণ কোন পরীক্ষার জন্য। দু-এক দিন পরে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর এই পাত্রে শুধু যে এই রোগজীবাণুটিই জন্মেছে তা নয়, আর একটি সবুজ রঙের অনাহুত নূতন ছত্রক সেই আগারের মাঝে মাঝে নিজের

উপনিবেশ স্থাপন করে বাড়ছে। সম্ভবত আগার-মাধ্যম তৈরি করার সময়ে, অথবা রোগজীবাণু বপন করার সময়ে, সামান্য অসাবধানতার ফলে বাতাস থেকে কোন ছত্রক-বীজ তার মধ্যে পড়ে থাকবে। সাবধানে পরীক্ষা করে ফ্লেমিং আরও লক্ষ্য করলেন যে, ছত্রকের এই উপনিবেশগুলির চারপাশে ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি যেন মন্ত্রের বলে বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় সেগুলি একেবারে গলে যাওয়াতে আগার-মাধ্যমটি অন্য অংশর মত ঘোলা না থেকে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তখন সেই ছত্রকের ক্ষুদ্র অংশ অন্য আগারে বা মাংসরসে পুনরায় বপন করে তিনি নির্ণয় করলেন যে, এই ছত্রকটির নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠীর ছত্রক অতিসাধারণ হলেও এই বিশেষ প্রজাতিটি মোটেই সুলভ নয়। নিপুণ পরীক্ষায় তিনি প্রমাণ করলেন, এই ছত্রক, নিজের বৃদ্ধির সময় শরীর থেকে এমন একটি বিষবস্তু নিঃসারণ করেছে যা স্ট্যাফাইলোককাস প্রভৃতি বহু জীবাণুর বৃদ্ধি দমন করে। নিঃসৃত হলদে রঙের বস্তুর এই অদ্ভুত গুণ উপলব্ধি করে তিনি এর নাম দিলেন পে নি সি লি ন। সুস্থ প্রাণীর শরীরে একে প্রয়োগ করে তিনি দেখলেন যে, এই বস্তুর বিষক্রিয়া নেই বললেই হয়। স্বভাবতই তাঁর আশা হল, এই আবিষ্কার চিকিৎসার কাজে লাগানো যাবে। সাধারণ অবস্থায় পেট্রি-ডিসের মত ছোট পাত্রের মাধ্যমে যে-পরিমাণ পেনিসিলিন জন্মে

তার শক্তি অতি অল্প। তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে সময় এই বস্তুকে আরও ঘনীভূত অবস্থায় আনতে পারা গেল না। কিন্তু এই অদ্ভুতকর্মা ছত্রকটিকে ফ্লেমিং ত্যাগ করলেন না। তিনি জীবাণুর মিশ্রণ থেকে কতকগুলি জীবাণু নষ্ট করে অন্যগুলিকে বিশোধিত করার কাজে এবং কোন কোন ক্ষত-চিকিৎসায় এই অশোধিত মাধ্যমকে লাগাতে থাকলেন।

পেনিসিলিনের উৎপাদন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য বুঝতে হলে ব্যাক্টিরিয়া-তত্ত্বের দু-একটা গোড়ার কথা জানা দরকার। আমাদের পরিচিত অধিকাংশ গাছ যেমন তাদের বীজ থেকে জন্মে, এবং তাদের ইচ্ছামত জন্মাতে ও বাড়াতে গেলে যেমন তাদের বীজকে উপযুক্ত সারবান মাটিতে বপন করতে ও তার জন্য জল, বায়ু, তাপের সুব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রকজাতীয় অণু-উদ্ভিদও তার স্পোর বা রেণু থেকে জন্মে ও তার বৃদ্ধির জন্য নানা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। অন্য গাছের মতই রেণু মাটিতে পড়লে ক্ষুদ্রকায় উদ্ভিদগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং বংশপরম্পরায় অতি-দ্রুত বেগে বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্র বলেই তারা মাটি ছাড়া অন্য অনেক জিনিসের উপরেও বাড়তে পারে; যেমন—রুটি, ভাত, সিদ্ধ বা কাঁচা তরকারি, গুড় বা চিনির জল, এমন কি ভিজা কাগজ, কাপড় বা চামড়া। এ সকলের উপরে স্বাভাবিক অবস্থায়ই এরা জন্মে ও বাড়ে। এইসব

স্থান থেকে তাদের অতি-ক্ষুদ্র অদৃশ্য রেণু হাওয়ার সঙ্গে মিশে নূতন যে-কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপ্ত হতে পারে এবং হয়েও থাকে। এইসব অণু-উদ্ভিদ জাতিতেও যেমন অসংখ্য, এদের আকার-প্রকার, গুণ এবং স্বভাবও তেমনি বিভিন্ন। এদের ভাল করে চিনতে বা পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে পরীক্ষাগারে কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে, উদ্ভিদটিকে বার বার উপযুক্ত পোষক-মাধ্যমে জন্মানো, যাতে তার বিশিষ্ট আকার ও প্রকৃতি এবং বৃদ্ধির ফলে মাধ্যমে সংঘটিত বিবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এইসব খুঁটিনাটি বিশিষ্টতা পর্যালোচনা করে একটি ছত্রক অন্যটি থেকে আলাদা করে চেনা যায়। এই উদ্দেশ্যে গ্লুকোজ-সম্বলিত মাংসরস এবং সামুদ্রিক শৈবালজাত আগার হতে প্রস্তুত জেলিজাতীয় বস্তুই প্রধান। দ্বিতীয় বস্তুটির সুবিধা এই যে, গরম অবস্থায় তরল থাকলেও ঠাণ্ডা অবস্থায় জমে জেলির মত অর্ধকঠিন হয়ে যায়। সুতরাং নাড়া-চাড়ায় স্থানভ্রষ্ট হয় না এবং জীবাণু বা ছত্রকের উপনিবেশ-গুলিকে অবিচলিতভাবে ধারণ করে থাকে। এর সঙ্গে অন্য পোষক-বস্তু মিলিয়ে এতে যে-কোন ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া বপন করা যায়। এইসব জীবাণু প্লেটে আগারের উপরে কতক, আর কতক তার মধ্যে বাড়তে থাকে। দু-এক দিনের মধ্যে সুতো বা শুঁয়ার আকারে ছত্রকের জালক উপ্তি-কেন্দ্রের চারদিকে গোলাকারে

ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন অণু-উদ্ভিদ বৃদ্ধির সময় বুদ্বুদের আকারে গ্যাস উৎপাদন করে। কোনটি আবার লাল, হলদে, সবুজ, কালো বা নীল রঙের সৃষ্টি করে। এইসব বিশেষত্ব দেখে উদ্ভিদটির স্বরূপ স্থির করা যায়। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্লেটে একের অধিক ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া বপন করলে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে নিজের প্রকৃতি-অনুযায়ী বাড়তে থাকে এবং তাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে একটি থেকে আর একটিকে বেছে নেওয়া শক্ত হয় না। সুবিধার জন্য এই বপন কার্য চওড়া, চ্যাপ্টা, অগভীর ও গোল কাচের বাটিতে বা ডিসে করা হয়। প্রত্যেকটি বাটিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত চওড়া অনুরূপ বাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। এতে বাতাস থেকে অন্য অণু-উদ্ভিদের রেণু উপ্তিক্ষেত্রে ঢুকতে পারে না। এই ডিসগুলিকে 'পেট্রি-ডিস' বলে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাট্‌জার্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাক্টিরিয়াবিদ অধ্যাপক সেলমান এ. ওয়াক্‌স্‌মানও ফ্লেমিং-এর মত জীবাণু-শাসক ক্রিয়া বহুবার লক্ষ্য করেছিলেন। ফ্লেমিং-এর কাজে উৎসাহিত হয়ে তিনি এই গবেষণায় দ্বিগুণ মনোযোগ দিলেন। তাঁর একজন সহকর্মী, রেনি ডুবস, 1939 সালে রক্‌ফেলার ইনস্টিটিউট-অব-মেডিক্যাল-রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে নিঃসৃত এক নূতন বস্তু আবিষ্কার করলেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, সেই বস্তু

নিউমোককাস ও স্ট্রেপটোককাস নামক দুইটি জীবাণুর উপরে প্রবল ক্রিয়াশীল। এর আগেই 1932 সালে অক্সফোর্ড সহরে জীবাণুবিদ ক্লাটারবাক ও লভেল এবং ছত্রক-রসায়নবিদ রাইস্ট্রিক পোষক-মাধ্যম থেকে খাঁটি পেনিসিলিন উদ্ধারে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, তাপ, ক্ষার অথবা অম্লের আধিক্যে এ বস্তু সহজে নষ্ট হয় বলেই একে উদ্ধার করা ফ্লেমিং-এর সহকর্মীদের পক্ষে এত কঠিন হয়েছিল। মাধ্যমে কিছু অজৈব অম্ল যোগ করার পর জলে-অদ্রাব্য ঈথার দ্রাবকের সাহায্যে একে উদ্ধার করা যায়। 1938 সালে ইংরাজ জীব-রসায়নবিদ চেইন ও ফ্লোরি এই বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি ও শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণায় মনোযোগ দেন। ক্লোরোফর্ম অথবা অ্যামাইল-অ্যাসেটেট দ্রাবকের সাহায্যেও এর উদ্ধার সম্ভবপর। তাঁরা আরও দেখলেন, শতকরা একভাগ মাত্র পেনিসিলিনযুক্ত ঘনীভূত দ্রাবকও এত শক্তিশালী যে 5 লক্ষ গুণ জলে গোলার পরেও তা স্ট্যাফাইলোককাস-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক যত জীবাণুনাশক বস্তু সে-সময়ে জানা ছিল, তার মধ্যে একমাত্র অ্যাক্রিফ্লাভিন-এর শক্তি এত বেশি। ক্রমে ফ্লোরির তত্ত্বাবধানে চেইন, আব্রাহাম ও উইলিয়ম্‌স প্রমুখ একদল জীবাণুবিদ ডাক্তার এবং রসায়নবিদ দল বেঁধে পেনিসিলিন তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তিন বৎসরের

সমবেত কঠোর পরিশ্রমেও এই কঠিন সমস্যার আংশিক মাত্র পূরণ হল। বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পর 1940 সালে তাঁরা অল্প পরিমাণ কটা রঙের গুঁড়া তৈরি করলেন। তার শাসক-ক্রিয়া খুবই প্রবল হল। ইঁদুরের শরীরে স্ট্রেপটো এবং স্ট্যাফাইলোককাস-ঘটিত রোগে এবং কঠিন গ্যাস-গ্যাংগ্রিন রোগে সাল্‌ফানিলএমাইড পর্যায়ের কৃত্রিম ঔষধের চেয়ে এই বস্তু বহুগুণে শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হল। আবার অপেক্ষাকৃত অশোধিত অবস্থায়ও প্রাণিশরীরে এর বিষক্রিয়া এত অল্প যে, এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ উৎসাহবোধ করলেন। তখন অক্সফোর্ডে উইলিয়ম-ডান-স্কুল-অব-প্যাথলজি নামক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারী এবং সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধাকে এই বস্তু তৈরি ও বিশোধনের কাজে লাগানো হল। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে পেনিসিলিন তৈরি করতে যে-পরিমাণ শ্রম সময় ও অর্থব্যয় হল, তাতে তখন কেউ আশা করতে পারেন নি যে এ দিয়ে কোনদিন সাধারণ লোকের চিকিৎসা চলতে পারবে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে-আহত সৈনিকদের চিকিৎসায় এর মূল্য বুঝতে পেরে 1941 সালে অক্সফোর্ড-কর্মীদের অগ্রণী অধ্যাপক ফ্লোরিকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে সাব্যস্ত করলেন। কারণ সে-দেশ তখন রাসায়নিক শিল্পে এত উন্নতি করেছিল যে একমাত্র সেখানেই এই কঠিন প্রস্তুতি সম্ভবপর বলে তাঁদের ধারণা হল।

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা

লোকসানের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও কারখানার মালিকরা এই কঠিন কাজে হাত দিতে প্রথমে ইতস্তত করতে লাগলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট এর মূল্য সহজে উপলব্ধি করলেন এবং নর্দার্ন-রিজিওন্যাল-রিসার্চ-ল্যাবরেটরি নামক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে এই কঠিন কার্যের সম্পূর্ণ ভার দিলেন। এখানে অল্পদিনের মধ্যেই ডাঃ রবার্ট কগ্‌হিল প্রথমে দেখালেন যে, বিশেষ অবস্থায় মাধ্যমে পেনিসিলিনের উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। ন্যাশনাল-রিসার্চ-কাউন্সিল-এর চিকিৎসা-গবেষণা সমিতির তত্ত্বাবধানে ডাঃ এ. এন. রিসার্ডস রাসায়নিক পরীক্ষায় এবং ডাঃ ডি. এস. কীফার রোগচিকিৎসায় এর প্রয়োগনিপুণতা দেখার ভার নিলেন। 1943 সালের গোড়ার দিকে গোয়াডালক্যানাল-এর-যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত মার্কিন সেনাদের শরীরে একে প্রয়োগ করে বহু কঠিন ক্ষত আরোগ্য করা সম্ভবপর হল। তারপর থেকে সেনাবিভাগের ডাক্তারেরা প্রচুর পরিমাণে এই বস্তু উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবি জানালেন। শীঘ্রই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠিত হল। পূর্বোক্ত নর্দার্ন-রিজিওন্যাল-রিসার্চ-ল্যাবরেটরির ফারমেন্টেসান বিভাগের কর্মী রবার্ট কগ্‌হিলের উপরেই এর উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের ভার

পড়ল। এ ছাড়া পেন্‌সিলভানিয়া স্টেট কলেজ এবং উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়েও এর উৎপাদন ও বিশোধনের চেষ্টা সুরু হল। যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা ও স্ট্যানফোর্ড এবং কানাডার টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশি পেনিসিলিন দিতে পারে এমন ছত্রকের সন্ধান করার ভার দেওয়া হল। লিলি, চার্লস ফিজার, ফন্ হায়ডেন প্রভৃতি কয়েকটি সুবৃহৎ রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কারখানাতেও এ বিষয় পরীক্ষা করে দেখবার আদেশ এবং সুযোগ দেওয়া হল। গভর্ণমেণ্ট এই সব প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পেনিসিলিনের সমস্তটুকুই নিজে ক্রয় করতে প্রতিশ্রুত হলেন।

এই বিরাট প্রচেষ্টার মধ্যে ফ্লেমিং-এর প্রাথমিক দান অতি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু পেনিসিলিয়ামের এই শাসক-ক্রিয়া তিনি লক্ষ্য না করলে, বিশেষত এই আবিষ্কারের সম্ভাব্যতার দিকে সকলের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ না করলে, এ আবিষ্কার হয়তো বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। এ কারণেই সারা পৃথিবী থেকে ফ্লেমিংকে বারবার বহুভাবে সম্মানিত করা হয়েছে।

ক্রমে প্রমাণিত হল যে, বায়ুবাহিত ছত্রকের রেণু এই আবিষ্কারের সূত্রপাত করলেও ভূমিবাসী অন্য কতকগুলি ছত্রক এবং জীবাণুই শাসক-বস্তুর প্রধান উৎস। ওয়াক্‌স্‌মান এই বিষয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব জীবাণু কি ভাবে নানাবিধ শত্রু ও অবস্থাবিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে

রেখেছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। এর মধ্যে অনেকেই যে রাসায়নিক বস্তু নিঃসারণ করে আত্মরক্ষা করে, এ সকল বিস্তৃত গবেষণায় তাই প্রমাণিত হল।

শাসকবস্তুর সত্তানির্ণয় ও ছত্রকের পরিবর্ধন

দ্রবণে শাসক-বস্তুর সত্তা প্রমাণ করতে হলে সারযুক্ত কিছু মাটি নিয়ে জলে আলোড়ন করে সেই জলের কিছুটা বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার উপ্তিক্ষেত্রের কতক অংশে লাগানো হয়। সক্রিয় ছত্রক বা ব্যাক্টিরিয়া তখন উপ্তিক্ষেত্রে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং তাদের উপনিবেশগুলি প্রথমে উপ্ত ব্যাক্টিরিয়াদের নষ্ট করে গলিয়ে ফেলে। তার ফলে এগুলির চারপাশে কতকটা অংশ বেশ পরিষ্কার স্বচ্ছ এবং জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। কোন কোন অনুসন্ধিৎসু গবেষক ছত্রকের বৃদ্ধি আরও উৎসাহিত করার জন্য তাদের উপ্তিক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়া বপন করেন। এতে ছত্রকের শাসক-শক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ে। শাসক-ক্রিয়া প্রমাণের আর এক উপায় আগারযুক্ত পোষকে ছত্রককে বপন করে তার এক ক্ষুদ্রাংশ ব্যাক্টিরিয়ার উপ্তিক্ষেত্রে স্থাপন করা। আগারে শাসক-বস্তু থাকলে তার চার-দিকের মাধ্যম স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ পর্যন্ত যে-সব শাসক-নিঃস্রাবী ছত্রক ও ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে জানা গেছে, তাদের অধিকাংশের বৃদ্ধিকালে বাতাসের দরকার হয়। এদের বায়ুজীবী বলে। এদের

উৎপাদনের জন্য প্রধানত চারিটি উপায় ব্যবহার করা হয় : (1) অনতি-গভীর পাত্রে তরল পোষক-মাধ্যমের উপরে ভাসমান অবস্থায় ছত্রক জন্মানো—এতে ক্রমে মাধ্যমের উপরে সাদা বা রঙীন শক্ত সরের সৃষ্টি হয় ; (2) অগভীর পাত্রে মাধ্যমের তলায় নিমজ্জিত অবস্থায় ছত্রককে বাড়তে দেওয়া—এই প্রক্রিয়ায় দ্রবণের উপরিভাগ থেকে বাতাস ধীরে ধীরে সঞ্চরণ-ক্রিয়া দ্বারা তলায় পৌঁছে, অথবা ছত্রকের বৃদ্ধির সময়ে পাত্রকে নাড়াচাড়ার ব্যবস্থাও করা হয় ; (3) গভীর পাত্রে মাধ্যমের সর্বাংশে ছত্রককে বাড়তে দেওয়া—এর জন্য পাত্রের নীচে-অবস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র বা নল দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস-চালানোর ব্যবস্থা থাকে ; (4) ভিজা জীবাণুমুক্ত ভুষির উপর ছত্রক জন্মানো, ভুষির প্রত্যেক কণার গায়েই ছত্রক জন্মে ও বাড়ে। ভুষির স্তর পুরু করে সাজিয়ে তার ভিতর দিয়ে বায়ু চলাচলের কৃত্রিম ব্যবস্থা করলে ছত্রক সহজেই বাড়তে থাকে।

ফ্লেমিং-এর ছত্রকের স্পোর (রেণু) সাধারণত জলের উপর ভাসমান অবস্থায় অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হয়। এজন্য অগভীর তরল মাধ্যমেই এদের উৎপাদন ও বৃদ্ধি সহজ। প্রথমে আগারে-উৎপন্ন সবুজ রঙের রেণুগুলি জলে ভাসিয়ে সেই জলের অল্প অংশ বোতল বা ফ্লাস্কে কৃত্রিম পোষকে বপন করা হয়। তারপর সেগুলোকে উপযুক্ত তাপে রাখলে দুদিনের মধ্যেই মাধ্যমের উপরে পাতলা সাদা

সর পড়ে। শীঘ্রই এই সর পুরু হয়ে সবুজ কোঁচকানো চামড়ার মত দেখায়। দশ দিনের পর মাধ্যমের রং হলদে দাঁড়ায় এবং শাসক-বস্তুর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। এই ভাবে মাধ্যমের উপাদান এবং ছত্রকের উপপ্রজাতি বিশেষ যত্নের সঙ্গে নির্বাচন করে শীঘ্রই শাসকের পরিমাণ বহুগুণে বাড়ানো সম্ভবপর হল।

শাসকের শক্তিনির্ণয় ও অক্সফোর্ড-মাত্রা

1940 সাল পর্যন্ত ইংরাজ কর্মীরা তরল মাধ্যমের প্রতি-ঘন-সেণ্টিমিটারে দুই অক্সফোর্ড মাত্রা (Oxford unit) পেনিসিলিন উৎপাদন করতে সমর্থ হন। মাধ্যমে কয়েকটি উত্তেজক বস্তু যোগ করার ফলে 1941 সালে এর পরিমাণ প্রথমে 5 গুণ ও পরে 20 গুণ বাড়াতে পারা গেল। যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা সুরু হওয়ার কিছু পরে 1942 সালে 'লিলি' কোম্পানির গবেষণাগারে উন্নত-ধরণের শক্তিশালী কাল্‌চার সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। এক বৎসরের মধ্যেই শাসক-উৎপাদনের পরিমাণ 50 হতে 100 গুণ বাড়ে। তারপরে পিওরিয়ার সরকারি গবেষণাগারে আবিষ্কৃত দুইটি উপপ্রজাতি ছত্রক মৌলিক পেনিসিলিয়াম-এর তুলনায় 150 গুণ শাসক উৎপাদন করতে সমর্থ হল।

বিভিন্ন জীবাণুর উপরে শাসক-ক্রিয়া পরীক্ষার জন্য ফ্লেমিং একটি সুন্দর ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। আগারযুক্ত পেট্রি-ডিসে একটি অগভীর সোজা লম্বা খাঁজ

কেটে গলানো-পেনিসিলিনযুক্ত আগার দিয়ে তিনি তা পূর্ণ করলেন। তারপর বিভিন্ন জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার 'কাল্চার' সরু তার বা কাচ-রডের সাহায্যে তার উপরে রেখার আকারে টেনে লাগিয়ে দিলেন। উপযুক্ত উষ্ণতায় রাখার পর দেখা গেল যে শাসকপূর্ণ গর্ত থেকে কিছু দূরে কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার উপনিবেশ বেড়েছে, কিন্তু গর্তের কাছে সেগুলি এগোতে পারে নি। এইভাবে একই পাত্রে একসঙ্গেই কয়েকটি বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার উপর শাসক-ক্রিয়ার পরীক্ষা সম্ভব হল। শাসক-বস্তুকে শুকনো গুঁড়ার আকারে পাওয়ার আগে পর্যন্ত শাসকযুক্ত কোন মাধ্যমের শক্তিশালিতা জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষা ছাড়া প্রমাণ করার উপায় ছিল না। এজন্য তিনটি উপায় ব্যবহৃত হত। প্রথমটিকে 'পর্যায়ক্রমে বিরলীকরণ', দ্বিতীয়টিকে 'সিলিণ্ডার-কাপ' অথবা 'কাপ-প্লেট' এবং তৃতীয়টিকে 'টার্বিডিমেট্রিক' প্রক্রিয়া বলে। প্রথম পরীক্ষায় শাসকযুক্ত মাধ্যমকে মাংসরস অথবা গলানো আগারের সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন মাত্রায় পাতলা করা হয়। এইসব পাতলা মাধ্যমের প্রত্যেকটিতে নাশপ্রবণ ব্যাক্টিরিয়া বপন করে তাকে উপযুক্ত তাপে যথাসময় রাখা হয়। শাসকের পরিমাণ কম থাকলে জীবাণু নষ্ট না হয়ে বাড়তেই থাকে, তাতে মাধ্যমটি ক্রমে ঘোলা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শাসক-বস্তুর মাত্রা যথেষ্ট থাকলে তা স্বচ্ছ ও পরিষ্কারই থাকে। মাধ্যমে জীবাণুর উপনিবেশ-সংখ্যা শাসক-বস্তুর পরিমাণের বিপরীত অনুপাতে বাড়ে।

'কাপ-প্লেট' পরীক্ষায় পেট্রি-ডিসে জমানো জীবাণুযুক্ত পোষক-মাধ্যমের মাঝে মাঝে ছোট-করে-কাটা কাচ বা অ্যালুমিনিয়মের মুখখোলা নল খাড়াভাবে বসানো হয়। তার পরে সেই নলের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় শাসকযুক্ত পাতলা মাধ্যম ভরে ডিসগুলিকে উপযুক্ত তাপে রাখা হয়। 12-14 ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে, শাসকের পরিমাণ অনুসারে নলের বাইরের জীবাণুযুক্ত আগার কম-বেশি পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে (নলের বাইরে) বিভিন্ন আকারের স্বচ্ছ চক্র-বেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। এই সব স্বচ্ছ বেষ্টনীর ব্যাস অতি সাবধানে মেপে শাসকের আপেক্ষিক পরিমাণ স্থির করা যায়। গোল-করে-কাটা ফিল্টার-কাগজ শাসকযুক্ত তরল মাধ্যমে ভিজিয়ে আরও সহজে এই পরীক্ষা করা চলে। জীবাণুবিদ হিট্‌লি প্রথমে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন।

তৃতীয় পরীক্ষায় শাসকযুক্ত মাধ্যম এমনভাবে পাতলা করা হয় যে, তা সমস্ত ব্যাক্টিরিয়াকে নষ্ট করে না। সুতরাং মাধ্যম কিছুটা ঘোলা থেকে যায়। ফটো-ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রে এই অনচ্ছতা মেপে শাসকের পরিমাণ স্থির করা চলে। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই এই পরীক্ষা করা যায়। সুতরাং অনেক পরীক্ষা অল্প সময়ে করতে হলে এই উপায়ই গৃহীত হয়।

শাসকের পরিমাণ-নির্ণয়ের জন্য ব্রিটিশ কর্মীরা একটি স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিট বা একক নির্দিষ্ট করলেন। এর মান

বা মাপ হল তাই, যা 50 ঘন-সেন্টিমিটার মাংসরসে থাকলে স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াস জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারে। হিট্‌লির 'কাপ-প্লেট' প্রক্রিয়া অনুসারে এই একক দাঁড়ায় সেই পরিমাণ, যা জীবাণুযুক্ত আগার-মাধ্যমে 24 মিলিমিটার (প্রায় এক ইঞ্চি) চওড়া স্বচ্ছ চক্র সৃষ্টি করে। অবস্থার তারতম্যে অবশ্য এই এককের কিছু কম-বেশি হতে পারে। এই কারণে পরে যথাসাধ্য বিশোধিত গুঁড়া পেনিসিলিনকে মাপকাঠি ধরে নূতন পেনিসিলিনের শক্তি নির্ণয় করা হয়। এইভাবে নির্ধারিত একককে 'ফ্লোরি ইউনিট' বা 'অক্সফোর্ড ইউনিট' (মাত্রা) বলে। ফ্লোরি এই নির্দিষ্ট মান বা নির্দিষ্ট শক্তিবিশিষ্ট পেনিসিলিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যান এবং একে অবলম্বন করেই সেখানকার কাজ চলতে থাকে। বর্তমান আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রায় এই মাত্রারই সমান। অতিবিশোধিত সোডিয়াম-পেনিসিলিনের এক মিলিগ্রাম এখন 1667 আন্তর্জাতিক মাত্রার সমান ধরা হয় (3 মিলিগ্রাম = 5000 মাত্রা)

অন্যান্য শাসক-বস্তুর আবিষ্কার

অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীই কোন-না-কোন জীবাণু-শাসক বস্তু তৈরি করে বলে জানা গেছে। কোন কোন শৈবাল, লাইকেন (ছত্রক ও শৈবালের সমবায়) এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ থেকে এই প্রকার বস্তু পাওয়া যায়। প্রাণিজ বস্তুর মধ্যে, ডিমের সাদা ও

হলদে অংশে, দুধ এমন কি মুখের লালা ও চোখের জলেও এ বস্তু অল্প পরিমাণে পাওয়া গেছে। বিস্তৃত পরীক্ষার ফলে অনেকগুলি বস্তু এইভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর দুটি অণু-উদ্ভিদ থেকে একই শাসক পাওয়া যায়, আবার একই ছত্রক থেকে দুই বা ততোধিক বস্তুও পাওয়া অসম্ভব নয়। পেনিসিলিয়াম থেকে এইভাবে পেনাটিন নামক আর একটি বস্তু পাওয়া গেছে। অ্যাস্পারগিলাস ফিউমিগেটাস থেকে ক্লাভাসিন, গ্লাইওটক্সিন এবং ফিউমিগেটিন, আর ব্যাসিলাস ব্রুসী থেকে গ্রামিসিডিন ও টাইরোসিডিন পাওয়া গেছে। এইসব শাসক-বস্তুকে তাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নানা রোগে ব্যবহার করার চেষ্টা হয়েছে।

ছত্রক ও ব্যাক্টিরিয়া এই দুই অণু-উদ্ভিদের মাঝামাঝি পর্যায়ের অ্যাকৃটিনোমাইসিস্ গোষ্ঠী থেকে দুটি শাসক-বস্তু আবিষ্কার করেন ডাঃ রেনি ডুবস। এদের নাম দেওয়া হয় স্ট্রেপটোথ্রিসিন এবং স্ট্রেপটোমাইসিন। এই দুটি বস্তুর আণবিক গঠন অপেক্ষাকৃত সরল। তরল পোষক-মাধ্যম থেকে সক্রিয় কাঠকয়লার গুঁড়ার সাহায্যে একে সংগ্রহ করা হয়। হাইড্রোক্লোরিক অম্লের লঘুকৃত দ্রবণের সাহায্যে একে কাঠকয়লা থেকে পুনরুদ্ধার করা যায়। দুটিরই শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয়টিই বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বর্তমান বই-এর পরিশিষ্টে কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। স্ট্রেপটোথ্রিসিন-এর বিষক্রিয়া

মৃদু হলেও স্থায়ী, আর স্ট্রেপটোমাইসিন-এর ক্রিয়া প্রবল এবং দ্রুত। অ্যাণ্টআমিবা কোলাই, ব্যাসিলাস শীগা এবং স্যালমোনেলা প্রভৃতি গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়ার উপরেও এর ক্রিয়া আছে (যা পেনিসিলিনের নেই)।

ব্যাসিলাস ব্রেভিস নামক ভূমিবাসী অণু-উদ্ভিদ থেকে টাইরোথ্রিসিন আবিষ্কার করেন রেনি ডুবস। এ থেকে আবার বিশ্লেষণের ফলে তিনি গ্রামিসিডিন এবং টাইরোসিডিন নামক দুটি বিশোধিত বস্তু পান। দুটিই পলিপেপ্টাইড পর্যায়ের বস্তু। এই ধরণের বস্তু প্রোটিনের জারণে উৎপন্ন হয়। এদের শক্তি যথেষ্ট। এক মিলিগ্রামের হাজার-ভাগের একভাগ একশত কোটি ব্যাক্টিরিয়া-সম্বলিত দ্রবণকে জীবাণুরহিত করতে পারে। তবে বিষক্রিয়া থাকার ফলে এগুলি প্রাণিশরীরে ব্যবহার অসুবিধাজনক। $\frac{1}{3}$ মিলিগ্রাম মাত্র প্রয়োগে একটি ইঁদুর মারা পড়ে, ঘায়ের উপর স্থানীয় প্রয়োগে বেশি অসুবিধা হয় না। রুশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি গ্রামিসিডিন-এস নামক আর একটি বস্তুর বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা করেছেন। একপ্রকার ব্যাসিলাস ব্রেভিস থেকে একে পাওয়া গেছে। ডুবসের গ্রামিসিডিন থেকে এর রাসায়নিক গঠন এবং শারীরতাত্ত্বিক ক্রিয়া বিভিন্ন। তবে এর প্রধান গুণ এর তাপসহিষ্ণুতা,—ফুটন্ত জলের উষ্ণতায়ও এ নষ্ট হয় না। গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণুর উপরেও এর ক্রিয়া আছে।

দুষ্ট ক্ষত, চর্মরোগ, অস্থি-বিকৃতি এবং ফুসফুসের কোন কোন রোগে এর ব্যবহারে ফল পাওয়া গেছে।

আরও অনেক শাসক-বস্তুর আবিষ্কার গত দশ বৎসরের মধ্যে ঘটেছে। তার মধ্যে যে-গুলির রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য জানা গেছে, সংক্ষেপে তাদের কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। পেনিসিলিক অম্ল পেনিসিলিয়াম সাইক্লোপিয়াম থেকে পাওয়া গেছে। শরীরের নানা রসে এর ক্রিয়া নষ্ট হয়। সুতরাং এর প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না। অ্যাস্‌পারগিলাস ক্লাভাটাম নামক ছত্রক থেকে ক্লাভাসিন বা পাটুলিন নামক বস্তু প্রথমে সর্দির ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয়েছিল। কিন্তু বিষক্রিয়া থাকার ফলে শুধু উদ্ভিদের রোগে একে ব্যবহার করা হচ্ছে। অ্যাসপারগিলাস ফিউমিগেটাস নামক ছত্রক থেকে ফিউমিগেটিন এবং পেনিসিলিয়াম স্পাইনুলোসাম থেকে প্রাপ্ত স্পাইনুলোসিন রঞ্জক-বস্তু। এরাও বিষক্রিয়ার জন্য অব্যবহার্য। অ্যাস্‌পারগিলাস ফ্লাভাস থেকে প্রাপ্ত অ্যাস্‌পারগিলিক অম্ল বিষক্রিয়া থাকলেও কোন কোন স্থলে প্রযুক্ত হয়েছে।

অ্যাকৃটিনোমাইসিস অ্যান্টিবাইওটিকাস নামক ছত্রক থেকে প্রাপ্ত অ্যাকৃটিনোমাইসিন-এর সঙ্গে ফিউমিগেটিন-এর কিছুটা রাসায়নিক মিল আছে। টেস্ট-নলে যক্ষ্মার জীবাণু নষ্ট করতে পারে বলে এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। জানা গেছে যে এর বিষক্রিয়া ভাইটামিন-সি প্রয়োগে কম

হয়। পেনিসিলিয়াম সিট্রিনাম থেকে সিট্রিনিন্ পাওয়া গেছে এরও বিষক্রিয়া প্রবল। এ ছাড়া গ্লাইওটক্সিন, পেল্ভলিক অম্ল ইত্যাদি আরও অনেকগুলি বিষক্রিয়াযুক্ত শাসক আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যবহার বেশি নেই।

সাধারণ রসুন থেকেও অতিসরল একটি গন্ধকঘটিত বস্তু পাওয়া গেছে। পেনিসিলিনের তুলনায় এর শক্তি $\frac{1}{100}$ ভাগ, কিন্তু বেশি মাত্রায় এরও বিষক্রিয়া আছে।

পেনিসিলিনের গুণ ও ধর্ম

বলা বাহুল্য এই সব বিভিন্ন শাসক-বস্তুর রাসায়নিক ও প্রাণিতাত্ত্বিক ক্রিয়া স্বতন্ত্র। পেনিসিলিনের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, শরীরের বিবিধ সুস্থ তন্তুর উপর তার বিষক্রিয়া নেই। এই সব তন্তুর স্বাভাবিক রস বা নিঃস্রাবে অথবা বিভিন্ন ভাইটামিনের ক্রিয়ায় পেনিসিলিন নষ্ট হয় না। ক্ষতের পুঁজ বা অন্যান্য বিকৃত বস্তু, রক্তকণিকা, রক্তরস ও রক্তমস্তুর ক্রিয়ায় এ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাল্ফানিলএমাইড কিন্তু এ-সবের ভিতরে ভাল কাজ করে না। আবার যে-সব জীবাণু সালফা-পর্যায়ের ঔষধকে প্রতিরোধ করে, তাদের উপরেও এর ক্রিয়া যথেষ্ট। অবশ্য পেনিসিলিনেরও কার্যকারিতার সীমা আছে। রক্তের যে শ্বেত-কণিকাগুলি ক্ষতপূরণ ও তন্তুর পুনর্গঠনে সাহায্য করে, এর ক্রিয়ায় তারাও নষ্ট বা ব্যাহত না হওয়ায়

শরীরের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে; অবশ্য মাত্রায় যথেষ্ট না হলে জীবাণুর প্রতিরোধ সম্ভব হয় না।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, পেনিসিলিন নাইট্রোজেন-ঘটিত অম্লজাতীয় জটিল বস্তু। এর অণুর আয়তন ও ওজন অপেক্ষাকৃত কম। অধিক তাপ ও অম্ল বা ক্ষারের ক্রিয়ায় এবং কতকগুলি রোগজীবাণুর ক্রিয়ায় এ সহজে নষ্ট হয়। প্রধানত প্রস্রাবের সঙ্গে এবং অল্প পরিমাণে পিত্তের সঙ্গে এ নিঃসৃত হয় বলে একে ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয়। প্রস্রাব থেকে আবার একে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কষ্টসাধ্য। বেরিয়াম, ক্যালসিয়াম ও সোডিয়াম-ঘটিত লবণের আকারে একে ব্যবহার করা যায়। স্থায়িত্ব বেশি বলে ইংলণ্ডে ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণই প্রথমে বেশি ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন কোহলের ক্রিয়ায় একে এস্টার-জাতীয় বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, তাদের ক্রিয়া একই রকম।

অম্লের আধিক্যে এ নষ্ট হয় বলে একে মুখ দিয়ে খাওয়ানো চলে না। কারণ পাকস্থলীতে নিঃসৃত অম্লপাচক রসে এ নষ্ট হয়ে যায়। তবে 'লিলি' কোম্পানির কর্মীরা দেখান যে কিছু বেশি সোডার সঙ্গে খাওয়ালে এই অসুবিধা দূর হয়। কারণ অম্লপ্রধান পাকস্থলী অতিক্রম করে এই মৃদু-ক্ষার ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে কাজ করতে পারে। ইঁদুরের শরীরে এইভাবে তাঁরা

স্ট্রেপটোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস এবং নিউমোককাস-এর আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। আবার বাদাম তেল, তুলার বীজের তেল অথবা চর্বির মধ্যে কণায়িত ভাবে (অর্থাৎ ইমালশান করে) একে প্রয়োগ করলেও এর কতক অংশ অন্ত্রে পৌছে উপকার করে।

প্রধানত রক্তনালীতে, পেশীর মধ্যে অথবা চর্মের নীচে সূচিদ্বারা পেনিসিলিন প্রয়োগই উৎকৃষ্ট পন্থা। মেনিন্‌-জাইটিস রোগে মেরু-রজ্জুর ঠিক বাইরে অবস্থিত মেরু-নালীতে একে প্রয়োগ করার দরকার হয়। প্রতি ঘণ্টায় 1000 থেকে 5000 মাত্রা পর্যন্ত যাতে শরীরে বর্তমান থাকে চিকিৎসকেরা তার দিকে লক্ষ্য রাখেন। প্রতি-ঘনসেণ্টিমিটার বিশোধিত জলে এক হাজার মাত্রা বা বেশি গুলে নিয়ে তার এক থেকে পাঁচ গুণ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সূচি-প্রয়োগ করা হয়। কঠিন রোগে একই দিকে এক লক্ষমাত্রা পর্যন্ত দেওয়ার দরকার হতে পারে। বলা বাহুল্য ব্যবহারের সময় দ্রবণকে সর্বদাই বরফের মধ্যে ঠাণ্ডা রাখা দরকার, নচেৎ শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা। বরফের মত ঠাণ্ডা দ্রবণ সূচি-প্রয়োগ করলে রোগীর শরীরে বেদনা জন্মে, এবং সেজন্য ছোট ছেলেমেয়েদের চিকিৎসায় কিছু অসুবিধা হয়।

রক্তের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ পেনিসিলিন বজায় রাখতে না পারলে চিকিৎসায় ফল হয় না। রক্তের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ নিয়মিত করার এবং প্রস্রাবের সঙ্গে

নির্গমন নিয়ন্ত্রিত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বেশি পরিমাণ সোডার (সোডিয়াম বাইকার্বনেট) মত কোন মৃদুক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে পাকস্থলীর অম্ল-পাচক রসের ক্রিয়া কতকটা নিবারণ করা যে সম্ভব, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, প্যারা-এমিনো-হিপিউরিক অম্ল পেনিসিলিনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে বৃক্ক-যন্ত্র তাকেই নিঃসারণ করতে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং রক্তে পেনিসিলিনের পরিমাণ অনেকক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকে। এতে উপকার বেশি পাওয়া যায়। আবার সূচিবেধের স্থানটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখলে রক্ত-সঞ্চলন মৃদু হওয়ায় এ সহজে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না। বাদাম তেল ও মোমের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলেও একই ফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি এ বিষয়ে যে আরও উন্নতি করা গিয়েছে, সে সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করা যাবে।

বাহ্য-প্রয়োগের জন্য জলে অথবা ভ্যাসেলিন ও জলের মিশ্রণে (ইমালশান) অথবা সাল্‌ফানিলএমাইড ও ম্যাগনেসিয়ার গুঁড়া মিশিয়ে একে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা যায়। বর্তমানে নানারকম মলমের আকারে এর প্রয়োগ চলছে। তবে সাধারণ তাপে ও সাধারণ অবস্থায় এদের গুণ কতটুকু বজায় থাকে তার খোঁজ নেওয়া দরকার। বাদাম তেল বা চর্বির মধ্যে কণায়িত অবস্থায় খাওয়ালে কিছু অংশ পাকস্থলীর অম্ল অতিক্রম করে ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে উপকার করতে পারে। তবে এই

সকল সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে সূচি-প্রয়োগই বুদ্ধির কাজ।

পেনিসিলিনের ক্রিয়া

প্রাণিশরীরে রোগ-উৎপাদক ব্যাক্টিরিয়াদের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর করার জন্য কৃত্রিম রঙের প্রয়োগ দ্বারা তাদের শরীর নীল বা লাল করা হয়। অরঞ্জিত অবস্থায় এই অতিক্ষুদ্র এবং অতিস্বচ্ছ জীবগুলিকে দেখা প্রায় অসম্ভব। ব্যাক্টিরিয়াবিদ্ গ্রাম নানা নিপুণ পরীক্ষার ফলে এই অণু-উদ্ভিদগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করেন—গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ। এদের প্রথম শ্রেণী গ্রামের প্রথায় রঞ্জিত হলে জেন্‌সিয়ান-ভায়োলেট নামক বেগুনি রং গ্রহণ করে, আর দ্বিতীয় শ্রেণী তা করে না। সুতরাং প্রথম শ্রেণীকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে বেগুনি দেখায়। দেখা গেছে যে, পেনিসিলিন সাধারণত গ্রাম-পজিটিভ ব্যাক্টিরিয়ার উপরেই ক্রিয়াশীল। এগুলির মধ্যে স্ট্রেপটোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস, নিউমোককাস, গনোককাস ও মেনিন্‌জোককাস প্রধান। কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েনজা, কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি রোগের গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাক্টিরিয়া, সিফিলিস ও কুম্ভকর্ণ রোগের প্রোটোজোয়া এবং যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ রোগের অম্লরোধী ব্যাক্টিরিয়ার উপর এর ক্রিয়া নেই বললেই চলে। সুতরাং নানা জাতীয় ফোঁড়া, ব্রণ, ঘা, রক্তদুষ্টি, টন্‌সিলপ্রদাহ, ম্যাস্টয়েড গ্রন্থি-

প্রদাহ, গ্যাংগ্রিন এবং অস্টিওমাইলাইটিস নামক কঠিন অস্থিবিকৃতি রোগেও এতে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। যুদ্ধে-আহত সৈনিকদের নানাপ্রকার দুষ্ট ক্ষতে বিশেষ সুফল দেখার পরই যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-চিকিৎসকেরা এই বস্তুর প্রচুর প্রস্তুতির জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে বিশেষ তাগিদ আরম্ভ করেন।

প্রোফ্লাভিন, গ্রামিসিডিন, সাল্‌ফনেমাইড, জিংক-পারঅক্সাইড ইত্যাদি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম যে সকল জীবাণু-নাশক আগে ব্যবহার হত, তাদের তুলনায় পেনিসিলিনের ক্রিয়া অনেক শক্তিশালী এবং ক্ষতিলেশহীন। তাছাড়া ঔষধ প্রয়োগের অতি অল্পকাল পরেই এর উপকারিতা সুরু হয়। কঠিন রোগে মুমূর্ষু রোগীকেও বহুক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার ভিতরে জ্বর, বেদনা ও ব্যাধিক্লেশমুক্ত হতে দেখা গেছে। কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই এই সব রোগী চলতে ফিরতে ও কাজ করতে পেরেছে। অবশ্য রোগের প্রাবল্য এবং জটিলতার অনুপাতে এর মাত্রা বেশি বা কম করা হয়। কঠিন অবস্থায় দিলে এক লক্ষ মাত্রা দরকার হতে পারে, তবে সাধারণত তিন ঘণ্টা অন্তর এক হাজার থেকে তিন হাজার মাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করাই যথেষ্ট। রোগের তীব্রতা কম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের মাত্রাও কমিয়ে আনা হয়। জ্বর ও যন্ত্রণার লাঘব, রোগীর আরামবোধ, ক্ষুধাবৃদ্ধি ইত্যাদি সুলক্ষণ। তবে খুব তাড়াতাড়ি ঔষধের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াও

ঠিক নয়, কারণ রোগজীবাণুর মধ্যে কতকগুলি সহজে, কতকগুলি কিন্তু বিলম্বে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জীবাণুগুলিকে কাবু করতে হলে গোড়া থেকেই বেশি পরিমাণ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া মনে রাখা দরকার যে, পেনিসিলিন রক্ত থেকে অতি শীঘ্র মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে এবং মূত্রের সঙ্গে শরীর থেকে নির্গত হয়। সুতরাং রোগজীবাণু নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়। চিকিৎসাকালে মধ্যে মধ্যে রক্ত পরীক্ষা করে ব্যবহার্য পেনিসিলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পেনিসিলিন দুর্মূল্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে এর অযথা অপচয় বা অপপ্রয়োগ নিবারণ করাই উচিত। বলা বাহুল্য, জলে গোলার পর সাধারণ তাপেই পেনিসিলিনের গুণ নষ্ট হয়। সুতরাং বরফের মধ্যে এই দ্রবণ ঠাণ্ডা রাখা দরকার। গুঁড়া অবস্থায় এবং বায়ুশূন্য পাত্রে অবশ্য একে রাখা বর্তমানে অনেকটা সহজ হয়েছে। পেনিসিলিনের উৎপাদন এবং রক্ষার প্রধান বিঘ্ন এই যে বেশি তাপ, অম্ল, ক্ষার এবং বহু সাধারণ জীবাণুর ক্রিয়ায় এ সহজেই বিকৃত বা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং বাতাসে ভাসমান জীবাণু থেকে একে রক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। আবার বিশেষ অবস্থায় পেনিসিলিয়াম ছত্রক নিজেই আর একটি শাসক-বস্তু নিঃসারণ করে। তার নাম পেনাটিন বা নোটাটিন বা পেনিসিডিন বা পেনিসিলিন-বি। এর

রাসায়নিক প্রকৃতি পেনিসিলিন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি প্রোটিনজাতীয় জটিল বস্তু। রক্তমস্তু এবং পুঁজের ক্রিয়ায় এ নষ্ট হয়। এর বিষক্রিয়া থাকায় পেনিসিলিন তৈরির সময় একে সাবধানে পরিহার করতে হয়।

পেনিসিলিনের উৎপাদন ও বিশোধন

পেনিসিলিনের প্রচুর প্রস্তুতির জন্য মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। প্রথমে জীবাণুমুক্ত মাটিতে শূন্য ডিগ্রী উষ্ণতায় রক্ষিত বীজ থেকে টেস্ট-নলের মধ্যে আগারে তৈরি হয় 'কালচার'। তারপরে সেখান থেকে তাকে ভিজা গমের ভুষিতে বপন করা হয়। ভুষিতে উৎপন্ন বীজ জলে ভাসিয়ে 'বাজুকা' নামক ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে তাকে তরল পোষক-মাধ্যমপূর্ণ ছোট ট্যাংক-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখান থেকে আবার তাকে পাঠানো হয় পাম্পের সাহায্যে আরও অনেক বড় ট্যাংক-এ। এই ভাবে পর্যায়ক্রমে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়। যাতে কোন অবস্থায়ই কর্মীদের শরীর, হাত, পোষাক অথবা হাওয়া থেকে ধূলা বা জীবাণুর বীজ ট্যাংক-এ ঢুকতে না পারে সেজন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ, পোষক-মাধ্যমের পাত্র, প্রত্যেক উপাদান, এমন কি মাধ্যমের ভিতরে সঞ্চালনের বাতাসকে পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত করার এবং রাখার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। কারখানার প্রত্যেক কর্মীর শরীর বা

কাপড়-চোপড় যাতে রোগজীবাণু বহন করতে না পারে এবং যাতে তারা সব সময়ে রোগজীবাণুমুক্ত থাকে তার জন্যেও বিস্তৃত ব্যবস্থা রাখা হয়। কারণ আগে বলা হয়েছে যে, কোন কোন রোগজীবাণু বা অন্য সাধারণ জীবাণু পেনিসিলিনকে নষ্ট করতে পারে। সুবৃহৎ ট্যাংক-গুলিতে পেনিসিলিন-উৎপাদন শেষ হলে তাতে ভাসমান ছত্রক-জালকের ঘন পর্দা বা সর (মাইসেলিয়াম) ফিলটার যন্ত্রে ছেঁকে তরল অংশ পৃথক করা হয়। এই তরল অংশ শোষণ-ট্যাংক্-এ স্থানান্তরিত করে যন্ত্রের সাহায্যে উপযুক্ত শোষক-বস্তুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নাড়া হয়। তাতে গুঁড়া-শোষকের মধ্যে পেনিসিলিন আট্‌কা পড়ে। আবার ফিলটার-যন্ত্রে ছেঁকে নিয়ে এই শোষক অ্যাসিটোন-দ্রাবকে নাড়া হয়। শোষক থেকে তখন পেনিসিলিন বেরিয়ে আসে, কিন্তু কতকগুলি বাজে জিনিস আট্‌কা পড়ে। এই দ্রাবককে আবার ভ্যাকুয়াম যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পেনিসিলিন হলদে গুঁড়ার আকারে বেরিয়ে পড়ে। এর পরে তাকে আর একটি জৈব দ্রাবকে গুলে আবার ছাঁকা হয়। তাতেও কতক বাজে জিনিস বাদ পড়ে। এই দ্রবণ ঘনীভূত করে পেনিসিলিনকে প্রথমে বেরিয়াম ও পরে সোডিয়াম-ঘটিত লবণে পরিণত করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত গুঁড়া বিশেষ সাবধানে ওজন করে কাচনলে (অ্যাম্প্যুল) ভরা হয়। এই কাজের সময় টেবিলের উপরে স্টেরি-ল্যাম্প নামক অতি-বেগুনি আলো জ্বালিয়ে

রাখা হয়। তার ফলে টেবিলের উপরকার হাওয়ার জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় বলে সেগুলি আর পেনিসিলিনের ক্ষতি করতে পারে না। এত সাবধানে তৈরি জিনিসের মধ্যেও জ্বর-উৎপাদক কোন বিষবস্তু আছে কিনা, গিনিপিগের শরীরে অতিসামান্য পরিমাণ সূচি-প্রয়োগ করে তা দেখা হয়। তাছাড়া গুঁড়ার মধ্যে জলীয় অংশ, বিষবস্তু ও শক্তির পরিমাণ অতি সুকৌশলে ও সন্তর্পণে নির্ণীত হয়। যে-সব সুবৃহৎ কারখানায়, বিরাট যন্ত্রপংক্তিতে এই উৎপাদন ও বিশোধন সম্পন্ন হয়, তা বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। শুধু অতিসংক্ষেপে মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া হল।

এক আউন্স পেনিসিলিন তৈরি করতে 500 কোয়ার্ট বা $15\frac{1}{2}$ মণ তরল পোষক-মাধ্যম দরকার। সুতরাং কোটি কোটি মাত্রা বস্তু তৈরি করতে কি পরিমাণ অর্থব্যয় এবং কি আকারের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তা সহজে ধারণা করা যায়। 1943 সালে উৎপাদনের প্রথম দিকে 1000 গ্রাম (প্রায় এক সের) বস্তু তৈরি করতে 50,000 ডলার ব্যয় হত। 1944 সালের 1লা মার্চ এই প্রস্তুতির পরিমাণ 55 গুণ বেড়ে যায়। উনিশটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে এই কাজ সুরু হয়। এদের মধ্যে ছোট কারখানাগুলিতে মাসে 40 কোটি এবং বড় কারখানাগুলিতে 2000 কোটি মাত্রা বস্তু তৈরি করা সম্ভবপর হয়। উপরে যে-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তাতে প্রথমে-প্রস্তুত পেনিসিলিনের প্রতি মিলি-

গ্রামে 100-400 অক্সফোর্ড-মাত্রা পাওয়া যেত। ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নূতন ধরণের শক্তিশালী ছত্রক ব্যবহারের ফলে পরে প্রতি মিলিগ্রামের শক্তি 1667 আন্তর্জাতিক মাত্রায় দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে প্রস্তুতির পরিমাণ আরও অনেক বেড়ে যাওয়াতে দাম কমে সাধারণের সাধ্যের মধ্যে এসেছে।

পেনিসিলিনের নূতন ব্যবহার

আমেরিকার চিকিৎসক সমিতি প্রমাণ করেছেন যে, পাস্তুরিত বোতলের দুধ এবং টিনে-রক্ষিত ফল ও তরকারির মধ্যে যে অল্পপরিমাণ জীবাণুর স্পোর (রেণু) থেকে যায়, পাত্র বন্ধ করার ঠিক আগে তার মধ্যে সামান্য পেনিসিলিন দিয়ে রাখলে তারা অবিলম্বেই প্রায় নির্মূল হয়।

গৃহপালিত জন্তুদের চিকিৎসার জন্য এক প্রকার বিশেষ পেনিসিলিন 'লেডারলে' গবেষণাগার থেকে বেরিয়েছে, এর নাম ভেটিসিলিন। ককাস-জাতীয় জীবাণু ও গ্যাস-গ্যাংগ্রিন জীবাণুর ক্রিয়ায় উৎপন্ন নানা রোগে এবং মেষাদির অ্যান্থ্রাক্স রোগে এতে প্রচুর উপকার হয়। রুগ্ন পশুদের বিনষ্ট করার নিয়ম থাকাতে যে কোটি কোটি ডলার নষ্ট হত, তা এই ঔষধ প্রয়োগে বন্ধ করা যাবে এমন আশা এখন পাওয়া যাচ্ছে। মুখের, দাঁতের ও মাড়ির কোন কোন রোগে পেনিসিলিন খুব উপকারী।

কালিফর্নিয়ার কলেজ-অব ডেন্‌টিস্ট্রির ডাক্তারেরা দেখিয়েছেন যে এতে অন্য চিকিৎসার চেয়ে ভাল এবং দ্রুত ফল পাওয়া যায়। দাঁত-তোলার পরের প্রদাহ, মাড়ি-প্রদাহ এবং মুখের কতকগুলি ঘায়ে পেনিসিলিনযুক্ত লজেন্স খেতে দিলে বেশ উপকার হয়। বেদনা, ফোলা এবং জ্বর অতি সহজে অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়।

পেন্‌সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ডাক্তার দেখিয়েছেন মাতার দেহে সিফিলিস রোগ থাকলে যে মৃতবৎসা রোগ হবার আশঙ্কা থাকে, গর্ভধারণের দশ সপ্তাহের মধ্যে পেনিসিলিনের প্রয়োগে তা রুদ্ধ হয়। আর্সেনিক-ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে আগে যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি হত, তা এখন আর ঘটতে পারে না। নানাজাতীয় মলমের আকারে পেনিসিলিনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বাড়ছে। তবে কিভাবে এর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা যায় এবং কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি এবং কতদিন ঔষধ লাগানো দরকার, তা জানা না থাকলে আনাড়ীর হাতে নানা বিভ্রাট ঘটতে পারে। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, ব্যাক্টিরিয়াকে পূর্ণ মাত্রায় ঔষধের সাহায্যে দ্রুত নির্মূল না করলে অনেক রোগজীবাণু ক্রমে পেনিসিলিন প্রতিরোধ করতে সুরু করে। তখন বেশী মাত্রায় ঔষধ দিলেও ফল পাওয়া যায় না। আবার বার বার চর্মের উপর পেনিসিলিন ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে চর্মপ্রদাহ জন্মে। এর ফলে ফুস্কুরি, পাঁচড়া বা হামের মত পীড়কার সৃষ্টি হতে পারে।

সম্প্রতি 'পেনিওরাল' নামক একটি নূতন রকমের পেনিসিলিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এর সূচি-প্রয়োগের দরকার হয় না, খেলেই উপকার পাওয়া যায়। পূর্ণবিশোধিত পেনিসিলিন যে অন্যপ্রকার পেনিসিলিনের চেয়ে বেশি স্থায়ী এবং শক্তিশালী তা সম্প্রতি ভাল করেই প্রমাণিত হয়েছে। পেনিসিলিন-জি নামে দানাদার গুঁড়া বস্তুই আজকাল সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। একে রেফ্রিজারেটর বা শীতযন্ত্রে রাখার দরকার হয় না। অবশ্য জলে গোলার পরে আর এই তাপসহিষ্ণুতা থাকে না, তখন দ্রবণকে বরফ জলে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

পেনিসিলিনের ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি

বিভিন্ন কারখানার মালিকেরা নিজেদের প্রস্তুত পেনিসিলিনের উপযোগিতা এবং বিক্রয় বাড়াবার জন্য নানা আকারে ও নানা নামে এর প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। ফলে ক্রেতা ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। হাঁস মুরগী ইত্যাদির জন্য বের হল পোল্ট্রি-সিলিন, গবাদি গৃহপালিত পশুর জন্য হল ভেটিসিলিন বা ডেয়ারিসিলিন, খাবার ঔষধ হিসাবে বের হল পেনিওরাল, দাঁতের রোগের জন্য ডেন্টিসিলিন। 'বাফ্যেলো' কোম্পানি নিজেদের নাম দিয়ে বের করলেন বাফোসিলিন; এ ছাড়া পেন-ট্রচি, পি.ও.বি. ইত্যাদি আরও অনেক নামে একে চালু করা হল। বর্তমানে

চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এ-সবের পরিবর্তে সহজবোধ্য কয়েকটি নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। যে-উপায়ে একে প্রয়োগ করা হবে, সে উপায়সূচক শব্দের সঙ্গে 'সিলিন' যোগ করাই বর্তমান রীতি। বাদাম তেল ও মোমের সঙ্গে কৌশলে কণায়িত (ইমালশান) করে 'ফ্লো-সিলিন' নামে এর বিশেষ প্রয়োগ চলছে। এতে তিন ঘণ্টা অন্তর সূচিপ্রয়োগ করা দরকার হয় না। দিনে একবার বা দুদিনে একবার সূচিবেধ করলেই চলে। তেলজাতীয় বস্তুতে থাকার ফলে বেধ-স্থান থেকে এ রক্তে ও নিকটস্থ তন্তুতে সহজে সঞ্চারিত হয় না—ধীরে ধীরে বহুক্ষণ ধরে এই প্রক্রিয়া চলে। সুতরাং ঔষধের স্থায়িত্ব বেশি হয়। এতে রোগীর ক্লেশ এবং চিকিৎসার ব্যয় কম পড়ে।

এই ধরণের আরও আধুনিক ঔষধের নাম 'সিংগলসর্ট প্রোডাক্ট-এফ'। যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এর আবিষ্কার করেন। বাদাম তেল ও অ্যালুমিনিয়াম-স্টেরেট-এর মিশ্রণে কণায়িত অবস্থায় অর্ধতরল জেলির আকারে একে বেধ-নলে রাখা হয়। এই নলকে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলেই এ তরল হয়ে যায়, তখন সূচিযন্ত্রে নিয়ে প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয় না। এর প্রধান সুবিধা এই যে, বেধের পরে 96 ঘণ্টাপর্যন্ত কাল ঔষধ বেধ-স্থানে জমা থাকে ও সেখান থেকে ধীরে ধীরে সারা শরীরে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং চার দিনে মাত্র একবার সূচি-প্রয়োগ করলেই

কার্যসিদ্ধি হয়। এর সঙ্গে আবার বেদনানাশক প্রোকেন মিশানো থাকায় বেধের পরে বেদনা হয় না। বলা বাহুল্য ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী এবং রোগী সকলে এই আকারেই ঔষধটি পছন্দ করেন।

পেনিওরাল নামক পেনিসিলিনের বড়ি খাইয়ে গনোরিয়া রোগের আক্রমণ নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে। সূচিবেধের স্থান ধাতুনির্মিত অ্যাপ্লিকেটর যন্ত্রের সাহায্যে ঠাণ্ডা করলে বেধের বেদনা কম হয়।

পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রচুর প্রস্তুতির সম্বন্ধে কিছু আভাস আগে দেওয়া হয়েছে। মাত্র ছয় বৎসর আগে যা শুধু গবেষণার বিষয় ছিল, বর্তমানে তা বিশেষ লাভজনক বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। 1948 সালে 16 কোটি ডলার (50 কোটি টাকা) মূল্যের পেনিসিলিন তৈরি হয়েছে। স্ট্রেপটোমাইসিন যক্ষ্মারোগে কার্যকরী কিনা তাই প্রমাণ করতে বহু বৎসরব্যাপী বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে এবং লক্ষ ডলার মূল্যের ঔষধ ব্যয় করা হয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীর এ-ধরণের বস্তু উৎপাদনে হাত দেওয়ার আশা সুদূরপরাহত। সৌভাগ্যক্রমে ভারত সরকার শীঘ্রই এদেশে পেনিসিলিন, সালফানিলএমাইড এবং ম্যালেরিয়ার কয়েকটি সুপরিচিত ঔষধ প্রস্তুতের জন্য কারখানা-স্থাপনে দৃঢ়সংকল্প হয়েছেন।

স্ট্রেপটোমাইসিন

আবিষ্কার

স্ট্রেপটোমাইসিন-এর আবিষ্কর্তা সেলমান ওয়াক্‌স-মানের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 1910 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং রাটজার্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস্‌সি. এবং কালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ্‌ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। অণু-উদ্ভিদ ও অণু-প্রাণীদের ক্রিয়ায় মাটিতে যে-সব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, ছাত্র-অবস্থা থেকেই তাঁর মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সব অণু-প্রাণী কি পরিমাণে থাকে, তাও তিনি নির্ধারণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে অনেক রোগের জীবাণু মাটিতে বাড়তে পারে না, বরং মাটিতে পড়লে তারা নষ্ট হয়ে যায়। গ্যাস-গ্যাংগ্রিন এবং ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁর ছাত্র রেনি ডুবস রক্‌ফেলার-ইনস্টিটিউট-ফর-মেডিক্যাল-রিসার্চ-এ কাজ করার সময় প্রথমে সন্দেহ করেন যে, মাটিতে এমন বস্তু আছে যা স্ট্রেপটোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস ও নিউমোককাস জীবাণু নষ্ট করতে পারে। এই সব পরীক্ষার ফলে তিনি ভূমিবাসী একটি জীবাণু থেকে নিঃসৃত 'টাইরোথ্রিসিন' নামক একটি রাসায়নিক বস্তু উদ্ধার করতে সমর্থ হন। প্রাণি-

শরীরে বিষক্রিয়া থাকায় চিকিৎসায় এ-বস্তুকে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি, তবু মূত্রাশয়ের প্রদাহে, পুরাতন দূষিত ফোঁড়া ও কার্বাংক্লে একে প্রয়োগ করে বেশ উপকার পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হয়ে অক্সফোর্ড সহরে অধ্যাপক ফ্লোরি ফ্লেমিং-আবিষ্কৃত পেনিসিলিনের চর্চায় আবার মন দিলেন। তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের সমবেত চেষ্টা যে সে-সময়ে খুব সফল হয়নি, তা আগেই বলা হয়েছে। তবে সকল দেশেই জীবাণুবিদেরা এই জাতীয় শাসক-বস্তুর উৎপাদনে গভীর মনোযোগ দেন। ওয়াক্সমানও আটজন সহকর্মীকে নিয়ে এই কাজে লেগে যান। কোন ভূমিবাসী জীবাণুর রোগবীজ-শাসক শক্তি পরীক্ষার জন্য সে-সময়ে তিনটি প্রক্রিয়ার ব্যবহার হত। (1) একটি ডুবস-আবিষ্কৃত ঘনীকরণ প্রক্রিয়া। এতে কোন রোগজীবাণুর 'কালচার' প্রতিদিন টবে মাটির মধ্যে ফেলা হয়। ভূমিবাসী শত্রুরা অবিলম্বে এই জীবাণুদের দমন করে শাসক-বস্তু প্রস্তুত করতে থাকে। কালক্রমে যথেষ্ট পরিমাণ শাসক জমা হলে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা হয়। (2) দ্বিতীয় উপায়, 'সিলিণ্ডার-কাপ' প্রক্রিয়া। এতে রোগজীবাণুর কালচার-এর সঙ্গে ভূমিবাসীর কালচার অল্প পরিমাণে মিশানো হয়। দমনক্রিয়া লক্ষিত হলে ভূমিবাসীর জাতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। এভাবেই পেনিসিলিনের আবিষ্কার ঘটে। (3) তৃতীয় উপায়, মটর-পরিমাণ মাটি অনেকটা জলে গুলে সেই জলের

সামান্য অংশ পেট্রি-ডিসে জমানো আগার-মাধ্যমে দেওয়া হয়। ভূমিবাসীর বৃদ্ধি তখন একজায়গায় স্তূপাকারে না হয়ে ছোট ছোট উপনিবেশের আকারে ঘটে। তখন যে উপনিবেশের চারদিকে মাধ্যমের রোগজীবাণু নষ্ট হতে দেখা যায়, তাকেই আলাদা করে নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়।

গোড়া থেকেই ওয়াক্‌সমানের এ-সব চেষ্টা খুব সফল হয়েছিল। তাঁর এক সহকর্মী এইচ. বি. উড্‌রুফ লক্ষ্য করেন যে, অ্যাকৃটিনোমাইসিস অ্যান্টিবায়োটিকাস জীবাণু এই কার্যে অদ্ভুত শক্তিশালী। এ থেকে নিঃসৃত শাসক অ্যাকটিনোমাইসিন 10 কোটি গুণ জলেও বহু সাধারণ এবং রোগসঞ্চারক জীবাণু নষ্ট করতে পারে। রোগ-উৎপাদক কতকগুলি ছত্রকের উপরেও এর ক্রিয়া মন্দ নয়। দুঃখের বিষয়, এ বস্তুরও যথেষ্ট বিষক্রিয়া থাকায় একে চিকিৎসায় লাগানো গেল না। কিন্তু এতে নিরুৎসাহ না হয়ে ওয়াক্‌সমান এবং অন্যান্য কর্মীরা বিভিন্ন স্থান হতে পচা পাতা ও পচা গোবর ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরীক্ষায় লেগে গেলেন। বহু নিষ্ফল পরীক্ষার পর অ্যাকৃটিনোমাইসিস ল্যাভেনডুলি নামক আর একটি ভূমিবাসী থেকে স্ট্রেপটোথ্রিসিন আবিষ্কৃত হল। পেনিসিলিনের চেয়ে বেশি সংখ্যক রোগে এ উপকারী বলে প্রমাণ পাওয়া গেল; এমন কি টাইফয়েড ও আমাশয় রোগে এবং অনেক কঠিন ক্ষতে এতে উপকার হল। এর চেয়েও বেশি

শক্তিশালী তৃতীয় বস্তু আবিষ্কার করলেন সহকর্মী অ্যালবার্ট স্থূল্ট্স,—এরই নাম স্ট্রেপটোমাইসিন। এইসব কারণে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রথমে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত না হলে স্ট্রেপটোমাইসিনই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ঔষধ বলে প্রচলিত হত।

স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস-এর দুটি উপপ্রজাতি এই কাজে ব্যবহৃত হল। একটি পাওয়া গেল সারযুক্ত জমি থেকে, আর একটি পাওয়া গেল রুগ্ন মুরগীর গলা থেকে। এই নূতন শাসকের শক্তি স্ট্রেপটোথ্রিসিন-এর চেয়েও বেশি। তাছাড়া এর বিষক্রিয়া নেই বললেই হয়। আবশ্যকের বহুগুণ বেশি মাত্রা ব্যবহারেও কোন ক্ষতি দেখা গেল না। যে-সব রোগে পেনিসিলিন অচল, তাদের নিয়ে তখন পরীক্ষা সুরু হল। 'আন্ডুলেণ্ট ফিভার' নামক কঠিন জ্বরের কোনও ঔষধ আগে জানা ছিল না, এই বস্তু সে-অভাব পূর্ণ করল। পালিত পশুদের শরীরেও এই রোগ 'ব্যাংস ডিজিজ' নামে প্রকাশ পায়। এ রোগে প্রাণী-বিনাশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে তিন কোটি ডলার লোকসান হত। প্রথমে ডিমের মধ্যে, পরে গিনিপিগের শরীরে এ রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে এই শাসকের উপকারিতা প্রমাণ করা হল। তারপরে প্যারাটাইফয়েড রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের শরীরে একে প্রয়োগ করা হল। ক্রমে 'র‍্যাবিট ফিভার' ও টাইফয়েড রোগে এতে উপকার পাওয়া গেল। এমন কি প্রথমে

টেস্ট-নলে এবং পরে গিনিপিগের শরীরে যক্ষ্মার জীবাণু জন্মিয়ে তার উপরেও এর শাসকক্রিয়া দেখা গেল। তবে মানুষের যক্ষ্মারোগে এর উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়নি। বলা বাহুল্য, এই রোগে উপকার হলে সমগোত্রীয় 'অ্যাসিড-ফাস্ট'-জীবাণুজাত কুষ্ঠ রোগেও এতে উপকার হবে আশা করা যায়। তাহলে মানুষের দুটি মহাশত্রু এ ঔষধের ক্রিয়ায় দমন করা সম্ভবপর হবে।

রাসায়নিক গুণ ও ক্রিয়া

পেনিসিলিন যেমন অম্লজাতীয় বস্তু, স্ট্রেপটোমাইসিন তার বিপরীত অর্থাৎ ক্ষারধর্মী। সুতরাং হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে উৎপন্ন এর লবণ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর দিয়ে এ সহজে রক্তে বিশোষিত হয় না। এজন্য ক্ষুদ্রান্ত্রের রোগে এ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে সচরাচর একে মাংসপেশীতে চর্মের নীচে বা রক্তনালীতে সূচি-প্রয়োগ করা হয়। এ বস্তুও প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু অংশ পিত্তের সঙ্গেও নিঃসৃত হয়। তবে পেনিসিলিনের তুলনায় এ কতকটা ধীরে ধীরে নিঃসৃত হওয়াতে উপকার বেশি এবং স্থায়ী হয়। রোগচিকিৎসায় এর 10 লক্ষ থেকে 20 লক্ষ মাত্রা প্রতিদিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পরিমাণের কোন বিষক্রিয়া নেই। আগেই বলা হয়েছে গিনিপিগের যক্ষ্মারোগে এতে উপকার পাওয়া গেছে।

মানুষের রোগে কতটুকু উপকার হয়, তা এখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি। মূত্রযন্ত্রের কতকগুলি কঠিন রোগে, ইন্‌ফ্লুয়েনজা-ঘটিত মেনিন্‌জাইটিস রোগে এবং ফুসফুসের ক্ষতে এতে বিশেষ উপকার হয়েছে।

প্রচুর প্রস্তুতি

সালফানিলএমাইড এবং পেনিসিলিনের পরেই স্ট্রেপটোমাইসিন-এর প্রচুর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস-এর দুটি উপপ্রজাতি থেকে এই বস্তু পাওয়া গিয়েছে। আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এ অতি উচ্চস্থান দখল করে। বিশেষত যুদ্ধের ফলে এ-জাতীয় বস্তুর চাহিদা খুব বাড়ে। 'মার্ক' কোম্পানির বিরাট রাসায়নিক কারখানা এই কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়। 'ওয়ার প্রোডাকসান্‌স-বোর্ড' এই বস্তুর মূল্য বুঝতে পেরে যাতে এই কোম্পানি অপরের চেয়ে আগে (প্রায়রিটিতে) রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই উৎপন্ন শাসকের নমুনা দেশের সমস্ত বড় বড় হাসপাতালে এবং পরীক্ষাগারে পাঠান হয়। 1945 সালের জুন মাসে রাওয়ে সহরে আলোচনায় নির্ধারিত হয় যে র‍্যাবিট ফিভার ও ইন্‌ফ্লুয়েনজা-ঘটিত মেনিন্‌জাইটিস নামক দুটি গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণুঘটিত রোগ ছাড়া' বহু গ্রাম-পজিটিভ জীবাণুঘটিত রোগেও এ

বিশেষ শক্তিশালী। কোন কোন জাতের যক্ষ্মারোগেও এর উপকারিতা স্বীকৃত হল। নৌ এবং সেনা বিভাগ এই বস্তুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট আরও দুটি কোম্পানিকে এর প্রস্তুতির ভার দিলেন। রসায়নবিদ্, শারীরতত্ত্ববিদ্ এবং ইঞ্জিনিয়ারগণের সমবেত চেষ্টায় স্ট্রেপটোমাইসিন তৈরির অতি উৎকৃষ্ট পন্থা শীঘ্রই নির্ণীত হল।

এই বিরাট প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত শুনলে অবাক হতে হয়। প্রথম প্রস্তুতির জন্য যন্ত্রপাতির মোট ব্যয়ই হল 35 লক্ষ ডলার। একৃটন সহরে তিনটি এবং রাওয়ে সহবে একটি বিরাট বাড়িতে এই যন্ত্রাবলীকে সাজান হল। বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ গ্রাম (প্রায় 220 পাউণ্ড পরিমাণ) শাসক এই কারখানাসমষ্টিতে তৈরি হচ্ছে। উৎপাদন সম্প্রতি আরও অনেক বেড়েছে। এই উৎপাদন চালু করার জন্য 50 হাজার টন কাঁচামাল এবং $4\frac{1}{2}$ কোটি গ্যালন জল ব্যবহার করা হয়। আর কোনরকম রাসায়নিক কারখানাতেই এত সামান্য পরিমাণ উপজাত দ্রব্য পাওয়ার জন্য এত বেশি কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় না।

প্রধানত পর পর চারিটি প্রক্রিয়া এই উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে ছত্রকের সাহায্যে পোষক-মাধ্যমে জারণ, দ্বিতীয়ত মাধ্যম থেকে শাসক-বস্তুকে শোষকের সাহায্যে উদ্ধার, তৃতীয়ত তার বিশোধন এবং চতুর্থত তাকে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় আনা ও তার বিশুদ্ধি ও

শক্তিপরীক্ষা। পোষক-মাধ্যমে শতকরা একভাগ গ্লুকোজ, ½ ভাগ পেপটোন, ½ ভাগ মাংসরস, আর ½ ভাগ সাধারণ লবণ থাকে। এসব পরিমাণের সামান্য অদলবদল করলে বা তাপ ও অম্লের মাত্রা বেশি হলে উৎপাদনের ক্ষতি হয়। মাংসরসের বদলে ভুট্টা-ভিজানো জল ব্যবহার করা চলে, তাতে খরচ কম হলেও বিশোধন কার্য কঠিন হয়। আবার গ্লুকোজের বদলে শ্বেতসার কিংবা গ্লিসারিন এবং পেপটোনের বদলে অ্যামিনো-অ্যাসিড অথবা ট্রিপটোন (জারিত প্রোটিন—প্রোটিনের উপর অগ্ন্যাশয়জাত ট্রিপসিন জারকের ক্রিয়ায় উৎপন্ন) অথবা সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রথমে কাঁচামালগুলি বিশগুণ জলে মিশিয়ে বিশেষ পাত্রে জমা রাখা হয়। তা থেকে আবশ্যক মতন পাম্প করে জারণ-পাত্রে (ফার্মেন্টার—যেখানে ছত্রক জন্মানো হবে) পাঠিয়ে 120° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় তাকে জীবাণু-মুক্ত করা হয়। পাত্রটিকে ঠাণ্ডা করে 25°-10° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে এনে স্ট্রেপটোমাইসিন-এর বীজ বপন করে 10°-25° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় রক্ষা করলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাধ্যমে স্ট্রেপটোমাইসিন উৎপন্ন করে। মাধ্যম সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না থাকলে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ অনেক কম হয়, অথবা বিশোধন-ক্রিয়া কঠিন হয়ে উঠে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য পাত্রের নল, জোড়, পাম্প, ভাল্‌ভ ইত্যাদির বাইরেটা বাষ্প (স্টিম) দিয়ে ঘিরে

রাখা হয়। আবার ওয়াক্‌সমানের মৌলিক ছত্রকের কালচার-এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বীজ নিয়ে এই বপনকার্য নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে এই বীজ জীবাণুমুক্ত মৃত্তিকার মাধ্যমে বরফের ঠাণ্ডায় রাখা থাকে। তার $\frac{1}{10}$ গ্রাম পরিমাণ প্রথমে গলিত আগারে বপন করে উপযুক্ত উষ্ণতায় রেখে তাকে অঙ্কুরিত করা হয়। তারপর বিশুদ্ধ জলে পাতলা করে তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশ আবার 300 ঘন-সেন্টিমিটার পোষকযুক্ত পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে নিমজ্জিত অবস্থায় এ বাড়তে থাকে। পাত্রগুলি যন্ত্রে নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থা থাকায় বায়ুসঞ্চলনের ব্যাঘাত হয় না। ছত্রকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম ক্রমে ক্ষারধর্মী হয়ে উঠে। টেস্ট-নল থেকে ফ্লাস্কে এবং ফ্লাস্ক থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট থেকে বড় চার সাইজের ইস্পাতের পাত্রে এই কালচার স্থানান্তরিত করা হয়। এতে মাধ্যমের পরিমাণের অনুপাতে ছত্রক-জালকের পরিমাণ ঠিক থাকে বলে নাশক-বস্তুর উৎপাদন বেশি হয়। প্রত্যেক পাত্রে উৎপাদনের অনুপাত, তাপমাত্রা ইত্যাদি একইরূপ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি কাজ মিলিয়ে সময় লাগে কয়েক দিন মাত্র। পাত্রের মধ্যস্থিত পাইপের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল চালিয়ে মাধ্যমকে 25°-30° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ঠাণ্ডা করার পর মাধ্যমের ভিতর দিয়ে অতি সাবধানে বিশোধিত বাতাস চালানো হয়। প্রতি

গ্যালনের ভিতর মিনিটে $\frac{1}{30}$ ঘন-ফুট বাতাস দেওয়া হয়। এই বাতাস এবং জারণে-উৎপন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের জন্য তরল-মাধ্যমে ফেনা উঠে। বাতাসের পরিমাণ ঠিক রাখতে না পারলে ফেনা বেশি হয়ে কাজের অসুবিধা ঘটায়, আবার বাতাস কম হলে শাসকের পরিমাণ কম হয়। 15 হাজার গ্যালন তরল-মাধ্যম থেকে অতি অল্প পরিমাণ শাসক পাওয়া যায়। তাও অতি সামান্য কারণেই নষ্ট হতে পারে। আবার কাজের যে-কোন অবস্থায় তিল-পরিমাণ রোগজীবাণু মাধ্যমে ঢুকেছে জানতে পারলে সবটা মাধ্যম ফেলে দিতে হয়, কারণ ঔষধটি তখন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। জারণক্রিয়ার পরে ছত্রকের জালক বা সূতালিকে বিশেষ ফিলটার যন্ত্রে ছাঁকা হয়। তারপর পরিষ্কার তরল অংশ থেকে শাসককে শোধিত গুঁড়া কাঠকয়লার সাহায্যে শোষণ করা হয়। এই কাঠ-কয়লাকে জলীয় অংশ থেকে আবার ছেঁকে ফেলা হয়। দু-বারই ফিলটার করার সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের ফলে তিলমাত্র শাসক লোকসান হয় না। বহু গবেষণার ফলে এ-সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'কণ্টিনিউয়াস-প্রেসার ফিলটার' নামক যন্ত্র ছাঁকনির কাজ করে। মাধ্যমের পরিমাণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ শোষক-বস্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আপনিই মাধ্যমে এসে পড়ে। কম হলে শাসকের সম্পূর্ণ উদ্ধার হয় না, আর বেশি হলে কতক শাসক শোষকে

আট্‌কা পড়ে যায়। কাঠকয়লার গাদকে পরে কোহলের মধ্যে গুলে সেই গোলা আবার ছাঁকা হয়। এতে অনেক বাজে জিনিস কয়লার মধ্য হতে বাদ পড়ে যায়। এই দ্রবণ থেকে তারপরে 'কোয়াড্রুপ্‌ল-এফেক্ট ইভাপোরেটর' যন্ত্র সাহায্যে অতিশীঘ্র দ্রাবককে পুনরুদ্ধার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাসকবস্তুযুক্ত কয়লা শুকনো গুঁড়ায় পরিণত হয়ে যায়, তা থেকে কোহলযুক্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে শাসককে নিষ্কাশিত করা হয়। 'টু-স্টেজ কাউণ্টার কারেণ্ট' নামক নিঃসারণ প্রক্রিয়ায় এই কাজ নিষ্পন্ন হয়। তাতে শাসক বেরিয়ে আসে, আর অনেক বাজে জিনিস কয়লায় আট্‌কা পড়ে থাকে। তারপর ক্ষারের দ্বারা এই অম্লত্ব নষ্ট করে ভ্যাকুয়াম পাম্পের সাহায্যে তাকে ঘন করা হয়। এই ভাবে যে গুঁড়া পাওয়া যায়, তাতে শতকরা 24 ভাগ মাত্র শাসক থাকে। সুতরাং আর একটি বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে অকেজো জিনিস বাদ দিয়ে শাসককে আবার উদ্ধার করতে হয়। এইভাবে বিশোধনের পর চিনামাটির (ব্যাক্টিরিয়া ছাঁকবার) ফিল্‌টার যন্ত্রে ছাঁকলে দ্রবণটি রোগজীবাণুমুক্ত হয়। তারপর ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে শুকিয়ে মরচে-ধরে-না-এমন (স্টেনলেস) স্টিলের ড্রামে বন্ধ করে তাকে রাওয়ে সহরে পাঠান হয়। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় যে-সকল সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, এখানকার কারখানায় তার চেয়েও বেশি সাবধানে কাজ চলে। প্রত্যেক কর্মীকে কারখানায় ঢোকা মাত্র

রাস্তার জামা-কাপড়-জুতো ছেড়ে জীবাণুমুক্ত পোষাক পরতে হয়। তারা যাতে কোনভাবে রোগজীবাণু বহন করতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। পরিশেষে অত্যন্ত সবধানে ড্রাম থেকে শাসককে ছোট ছোট কাচনলে ভরা হয়। 'স্টেরি ল্যাম্প'-এর আলোকে এবং কণায়িত মেথিলিন গ্লাইকল বাম্পের মধ্যে কাজ করায় ঘরের বাতাসের সমস্ত জীবাণু নষ্ট হয়ে যায় এবং কাচনলে কোন জীবিত রোগজীবাণু ঢুকতে পারে না। এত সাবধানে শাসক নলে ভরার পরেও তার কয়েকটিকে নিয়ে আবার পরীক্ষা করা হয় এর মধ্যে পাইরোজেন বা জ্বর-উৎপাদক বস্তু কিংবা রক্তের চাপ বৃদ্ধিকর কোন বস্তু আছে কিনা, অথবা এর শাক্তিশালিতা কি ?

কারখানায় তৈরি শাসকপূর্ণ কাচনলের প্রত্যেকটির সঠিক হিসাব রাখা হয়। একটি নলও কম হলে সকল কর্মচারীকে আটকে রেখে নলটির খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। কারণ, কোম্পানি প্রত্যেক নলস্থিত গুঁড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক খবর রাখতে চান। যার ইতিহাস নির্দোষ নয়, অর্থাৎ কি অবস্থায় সেটি তৈরি হয়েছে তা জানা নেই, তাকে বাজারে ছাড়া হয় না। কারণ একটি নলেও দুষ্ট বা নষ্ট বস্তু থাকলে শুধু যে রোগীর ক্ষতি হবে তা নয়, শাসক-বস্তুর এবং নির্মাতারও দুর্নাম হওয়ার সম্ভাবনা। প্রত্যেক কাচনলে সাধারণত এক গ্রাম (15 গ্রেন) স্ট্রেপটোমাইসিন

থাকে। কাচনলগুলিকে এমন আধারে রাখা হয়, যার উষ্ণতা 15° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে থাকে ; নচেৎ শক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। 1946 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অসামরিক প্রয়োজনেও এই শাসকের বিতরণ আরম্ভ হয়েছে। কারখানার মালিকেরা এই উদ্দেশ্যে প্রায় 10 লক্ষ ডলার ব্যয় করেছেন। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির দামই দুই লক্ষ ডলার। একৃটন সহরে 50-60 জন সুদক্ষ কর্মী এই কাজের প্রতি অংশটি নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রতিদিন শত শত নলের বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

ব্যবহার ও প্রয়োগবিধি

স্ট্রেপটোমাইসিন পেনিসিলিনের মতই সূচি-প্রয়োগে ব্যবহার হয়, তবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্রিয়ার দরুণ অনেক বেশি পরিমাণে দেওয়া দরকার। পেনিসিলিনের মত এর ব্যবহারের সময়েও কতকগুলি রোগজীবাণু প্রতিরোধ-শক্তি অর্জন করে বলে কিছু অসুবিধা হতে পারে, তাই গোড়াতেই ঔষধের পরিমাণ বেশি দিতে হয়। এতে কোন কোন রোগীর চর্মে ফোলা, বেদনা, পীড়কা ইত্যাদি স্থানীয় উপসর্গ ঘটে। বেশি দিন ও বেশি মাত্রা প্রয়োগে চর্মে হামের মত পীড়কা এবং মূত্রযন্ত্রে প্রদাহের সৃষ্টি হতে পারে। সব রকম যক্ষ্মারোগে এতে উপকার হয় না। অনুকূল ক্ষেত্রেও অত্যন্ত বেশি মাত্রায় তিন থেকে

ছ মাস পর্যন্ত দৈনিক তিন-চার বার প্রয়োগ করতে হয়। জীবাণুর কতক অংশ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করাতে চিকিৎসার গোড়ার দিকে যেমন ফল পাওয়া যায়, পরের দিকে আর তেমন হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে রোগের পুনঃপ্রকোপ দেখা দেয়। এতে তখন আর কোন উপকার হয় না। এর দামও যথেষ্ট, তাই এভাবে চিকিৎসা খুবই ব্যয়সাধ্য। তবে পেনিসিলিন ও সালফা-পর্যায়ের ঔষধে কাজ হয় না এমন কতকগুলি রোগে কার্যকরী বলে এর ব্যবহার এখনও যথেষ্ট চলছে। মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোন নবাবিষ্কৃত শাসকবস্তু এর স্থান দখল করবে। এগুলির কথা পরিশিষ্টে উল্লিখিত হল।

যক্ষ্মারোগে এর ব্যবহারে নিশ্চিত উপকার কতটুকু ঘটে, তা নিয়ে এখনও তর্কের শেষ হয় নি। যক্ষ্মা দীর্ঘস্থায়ী রোগ বলে দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা ছাড়া উপায় নেই। তবে গোড়ার দিকে জ্বর ও কাশির কতক উপশম, ক্ষুধাবৃদ্ধি, ওজনবৃদ্ধি এবং রোগীর সুস্থতাবোধ হয় বলে এর ব্যবহারের সার্থকতা আছে। তাছাড়া এর চেয়ে নির্দোষ এবং নিঃসংশয়ে উপকারী বস্তুর আবিষ্কার, প্রস্তুতি ও প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত 'মন্দের ভাল' হিসাবে একে ছাড়া চলে না।

পরিশিষ্ট

আধুনিক আবিষ্কার

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পেনিসিলিন আবিষ্কারের আগে ও পরে শক্তিশালী শাসকবস্তু প্রস্তুত করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় 40টি শাসকবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেকগুলি ছত্রক ও অণু-ছত্রক থেকে ও বাকি অর্ধেক ব্যাক্টিরিয়া থেকে পাওয়া গেছে। এদের প্রত্যেকটি নিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর উপর এবং সুস্থ ও অসুস্থ প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। তার ফলে অধিকাংশই বিষক্রিয়া এবং অন্যান্য দোষের জন্য বর্জিত হয়েছে। গত চার-পাঁচ বৎসরে যেগুলি আশাজনক ফল দিয়েছে, তাদের কয়েকটির কথা নীচে উল্লেখ করা গেল।

ইংলণ্ডে ওয়েলকাম-ফিজিওলজিক্যাল-রিসার্চ-ল্যাবরেটরিতে আইন্‌সওয়ার্থ, ব্রাউন এবং ব্রাউনলি একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে এয়ারোস্পোরিন উদ্ধার করেছেন। ডাঃ সুইফ্‌ট এর ক্রিয়া অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, ছেলেদের হুপকাশি রোগে (যে রোগের ভাল ঔষধ আগে জানা ছিল না) এবং টাইফয়েড রোগে এতে সুফল পাওয়া যায়। পেনিসিলিন এ-দুটি রোগে নিষ্ফল।

আর একটি ভূমিবাসী ব্যাক্টিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ডিপার্টমেণ্ট অব এগ্রিকালচার) রসায়নবিদ্ বেনেডিক এবং লংটাইক পলিমাইক্সিন নামক শাসক তৈরী করেছেন। ডাঃ সোইনবাক, ব্রে, বিশ এবং লং এ নিয়ে পরীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, অনেক গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণুর উপর এর ক্রিয়া আছে। এর মধ্যে আমাশয়, মেনিন্জাইটিস, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড ছাড়া ভাইরাস-ঘটিত র‍্যাবিট-ফিভার এবং আন্ডুলেণ্ট-ফিভার নামক কঠিন রোগেও এর প্রয়োগ হতে পারে। যক্ষ্মারোগে এতে বিশেষ উপকার হয়নি।

মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ কয়েল 1945 সালে ব্যাসিট্রোসিন নিয়ে পরীক্ষা করেন। গলা ও ফুস্ফুসের রোগে এতে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। অস্ত্রোপচারের পরে পুরাতন ক্ষতে, ফোঁড়া ও ঘায়ে এবং সিফিলিস রোগে এতে উপকার দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ মেলেনি একে প্রথমে প্রস্তুত করেন। সূচি-প্রয়োগের পক্ষে ভাল না হলেও কাটা, ফোঁড়া, ঘা, ব্রণ, চোখওঠা ইত্যাদিতে বাহ্যপ্রয়োগ করে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গেছে। বর্তমানে এর প্রচুর প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। লজেন্সের আকারে মুখের ও গলার রোগে এর ব্যবহার আরামদায়ক।

ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকান সহরের উপকণ্ঠে একটি চাষের ক্ষেতের মাটি থেকে ডাঃ বার্কহোল্ডার ক্লোরোমাইসিটিন প্রস্তুত করেন। এর উৎপাদন অপেক্ষাকৃত

সহজ। কয়েকটি পেনিসিলিনরোধী ভাইরাস রোগে এর ব্যবহার চলছে। এর মধ্যে দু-জাতীয় টাইফাস (এপিডেমিক টাইফাস এবং স্ক্রাব টাইফাস) ও প্যারট-ফিভার এবং টাইফয়েড জ্বরে এর ব্যবহারের কথা উল্লেখ-যোগ্য। যক্ষ্মারোগেও এতে উপকার পাওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলেছে। এর বিষক্রিয়া খুবই অল্প। তা ছাড়া শুধু খেলেই এতে উপকার হয়, সূচি-প্রয়োগ করার দরকার হয় না। অতি অল্পদিন আগে এর কৃত্রিম প্রস্তুতির কথা সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। সুতরাং শীঘ্রই এর দাম সস্তা হবে আশা করা যায়।

নোবেলপ্রাইজ-জয়ী ডাঃ ডয়েসি অ্যাসপারগিলাস ফিউমিগেটাস ছত্রক থেকে ফিউমিগেটিন প্রস্তুত করেছেন। যক্ষ্মায় এর উপকারিতা নিয়ে পরীক্ষা চলেছে। স্ট্রেপটো-মাইসিনরোধী জীবাণুকেও এ নষ্ট করে। দৈ-উৎপাদক অতিক্ষুদ্র জীবাণু থেকে নাইসিন তৈরি করেছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা। যক্ষ্মায় এর উপকারিতা নিয়েও পরীক্ষা চলছে।

‘লেডারলে’ কোম্পানির কারখানায় ডাঃ ডাগার অ্যাকটিনোমাইসিস গোষ্ঠীর একটি অণু-ছত্রক থেকে অ্যারিওমাইসিন পেয়েছেন। সোনার মত রং বলে এর এই নাম দেওয়া হয়েছে (ল্যাটিন ভাষায় সোনার প্রতিশব্দ অ্যরাম)। একেও সূচি-প্রয়োগ করার দরকার হয় না, খাওয়ালেই কাজ হয় স্পটেড-ফিভার, কিউ-ফিভার

প্রভৃতি জ্বরে এবং টাইফাস রোগে এতে ফল পাওয়া গেছে। এগুলি ভাইরাস-ঘটিত রোগ। ইন্‌ফ্লুয়েনজা রোগে এতে ফল হয় না। স্ট্রেপটোমাইসিনের চেয়ে এ শক্তিশালী এবং পেনিসিলিনের চেয়ে দ্রুত কাজ করে।

এসব আধুনিক ঔষধের প্রচুর প্রস্তুতির সঙ্গে দামও অনেক কম হলে সর্বসাধারণের চিকিৎসায় সত্যিই নূতন যুগ আসবে।

পরিভাষা ও টীকা

অক্সিডেসন—Oxidation, অক্সিজেনযোগ (রাসায়নিকভাবে)

অণু-ছত্রক—Mold, ছত্রকগোষ্ঠীর এক অতিক্ষুদ্রাকার শাখা।

অনচ্ছতা—Turbidity

অবায়ুজীবী—Anaerobic. বায়ুজীবী—Aerobic

অম্ল—Acid. অম্লত্ব—Acidity

অস্‌মস চাপ—Osmotic pressure

অস্টিওমাইলাইটিস—Osteomyelitis

অ্যাক্‌টিনোমাইসিস—ছত্রক ও ব্যাক্‌টিরিয়ার মাঝামাঝি একরূপ ক্ষুদ্র জীবাণু।

অ্যাক্‌টিনোমাইসিস অ্যান্টিবাইওটিকাস—Actinomycis antibioticus

,, ল্যাভেনডুলি— ,, lavendulae

অ্যান্‌থ্রাক্স—Anthrax

অ্যাপ্লিকেটর—Applicator

অ্যামাইল অ্যাসেটেট—Amyl acetate

অ্যাম্পুল—Ampoule

অ্যালবার্ট স্থল্‌ট্‌স—Albert Schults

অ্যাসপারগিলাস ক্লাভাটাম—Aspergillus clavatum

,, ফিউমিগেটাস ,, fumigatus

,, ফ্লাভাস ,, flavus

অ্যাসিড-ফাস্ট—Acid-fast, অম্লরোধক (অণুবীক্ষণে দেখার জন্য জীবাণুগুলি কাচের স্লাইডের উপর রঙিয়ে লওয়া হয়। এই স্লাইড লঘুকৃত সালফিউরিক অম্লে ডোবালে কতকগুলি জীবাণুর রং ঠিক থাকে। এগুলি acid-fast, অন্যগুলির রং এ প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়)।

আগার—Agar, সামুদ্রিক শৈবাল (Seaweed) থেকে প্রাপ্ত বস্তু—জলে গুলে ঠাণ্ডা করলে জেলির মত জমে যায়। জীবাণু জন্মাবার ও বাড়াবার কাজে এর ব্যবহার।

আঠাধর্মী প্রোটিন—Mucin

আনডুলেণ্ট ফিভার—Undulent fever, এই জ্বরে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি অত্যধিক ঘটে, আবার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছেদ হলেও বার বার জ্বরের আক্রমণ হয়। ভাইরাস-ঘটিত।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং—Alexander Fleming

ইমালশান—Emulsion

ইলিউসান—গুঁড়া-শোষকে শোষিত বস্তু দ্রবণের সাহায্যে পুনরুদ্ধার।

উত্তেজক বস্তু—Stimulant

উপনিবেশ—Colony (কলোনি), ব্যাক্‌টিরিয়া বা ছত্রকের উপ্তি-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধভাবে বৃদ্ধি।

উপপ্রজাতি—Subspecies. প্রজাতি—Species

এইচ. বি. উড্‌রফ—H. B. Woodruff

এক্‌টন সহর—Elkton

এণ্ট্‌আমিবা কোলাই—Entamoeba coli

এফ. ডব্লু. টর্‌জ—F. W. Torz

এস্টার—অ্যাসিড (অম্ল) ও কোহলের সংযোগে উৎপন্ন রাসায়নিক বস্তু।

O.S.R.D.—Office of Scientific Research & Development

ঔষধরোধী—Resistant

কণ্টিনিউয়াস-প্রেশার-ফিল্‌টার—Continuous-pressure Filter .

কাপ-প্লেট প্রণালী—Cup-plate method

কালচার—Culture, বপন, উপ্তি-কার্য, উপ্তি-মাধ্যম—যে মাধ্যমে জীবাণু জন্মানো হয়েছে।

কোয়াড্রুপ্ল-ইফেক্ট ইভাপোরেটর—Quadruple-effect Evaporater

ক্লাটারবাক—Clutterbuck

ক্ষারধর্মী—Alkaline

ক্ষুদ্রান্ত্র—Small intestine

গ্যাস-গ্যাংগ্রিন—Gas-gangrine, গ্যাস-উৎপাদনসহ ক্ষতের পচন, ব্যাসিলাস ওয়েলসাই নামক জীবাণুর ক্রিয়ায় ঘটে।

গ্রাম-পজিটিভ—Gram positive. জেনসিয়ান-ভায়োলেটে রঞ্জিত জীবাণু 'লুগল'-আয়োডিনে ডুবিয়ে কোহলে ধৌত করলে যে-গুলোর রং উঠে যায় না তাদের বলা হয় গ্রাম-পজিটিভ জীবাণু, আর যাদের রং একেবারে ধুয়ে যায় তারা হল গ্রাম-নেগেটিভ। অণুবীক্ষণে দেখবার জন্ম গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণুকে তখন অন্য রঙে রঙিয়ে নিতে হয়।

গ্রামিসিডিন-এস—Gramicidin S

গ্রুপ—Group, পরমাণুগুচ্ছ, জৈব বস্তুর সক্রিয়তা কতকগুলি পরমাণুগুচ্ছের কারণে ঘটে। জলে -OH, অ্যামোনিয়াতে $-NH_2$ ইত্যাদি গুচ্ছ আছে।

চারকোল—Charcoal, কাঠকয়লা-জাতীয় কার্বনপ্রধান বস্তু। কাঠকয়লা ছাড়া নারিকেল-ছোবড়া, ভুষি, হাড় ও রক্ত থেকেও প্রস্তুত হয়।

চেইন—Chain (একজন বিজ্ঞানী)

চার্ল্‌স ফিজার—Charles Pfizer

জালক বা সূতালি—Mycelium, ছত্রকের দৃশ্যমান অংশ।

জীবাণুজারক বস্তু—Bacteriophage, ব্যাক্টিরিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন তাদের নাশকারী বা জারণকারী বস্তু। এর মধ্যে অতিসূক্ষ্ম জীবাণু থাকে।

জীবাণুনাশক—Bactericidal

জীবাণুবারক—Antiseptic

জীবাণুনাশক বা নাশক—Antibiotic

জীবাণুস্তম্ভক—Bacteriostat, যা জীবাণুর বৃদ্ধি স্থগিত করে।

জীবাণুমোচন বা জীবাণুমুক্ত করা—Sterilize. জীবাণুমুক্ত—Sterile

জীবাণুসঞ্চার—Inocculation

জেনসিয়ান ভায়োলেট—Gentian violet

টাইরোথ্রিসিন—Tyrothricin

টারবিডিমেট্রিক—Turbidimetric

টু-স্টেজ কাউণ্টার কারেণ্ট—Two-stage counter current

টেস্ট-নল—Test tube

ডব্লু. ডি. ফ্রস্ট—W. D. Frost

ডি. হেরেল—d'Herelle

ডি. এস. কীফার—D. S. Keefer

তাপসংস্থান—Incubation, জীবাণুবৃদ্ধির জন্য মাধ্যমকে উপযুক্ত তাপে রক্ষণ।

দ্রবণ—Solution

দ্রাবক—Solvent

নাশপ্রবণ—Susceptible, sensitive

নিঃসারণ—Elution, গুঁড়া-শোষকে শোষিত বস্তু দ্রবণের সাহায্যে পুনরুদ্ধার।

পর্যায়ক্রমে বিরলীকরণ—Serial dilution

পলিপেপ্টাইড—Polypeptide

পাইরোজেন—Pyrogen

পাস্তুরিত—Pasteurised. পাস্তুরিত করা—Pasteurise

পুনঃপ্রকোপ—Relapse

পৃষ্ঠবিততি—Surface tension

পেট্রি-ডিস—Petridish

পেনিওরাল—Penioral

পেনিসিলিয়াম নোটেটাম—Penicillium notatum

" সাইক্লোপিয়াম— " cyclopium

" সিট্রিনাম— " citrinum

" স্পাইনুলোসাম— " spinulosum

পোষক বা পোষক-বস্তু—Nutrient

পোষক-মাধ্যম—Culture, যে মাধ্যমে জীবাণু জন্মানো হয়েছে।

পৌনঃপুনিক জ্বর—Relapsing fever

প্রজাতি—Species, উপপ্রজাতি—Subspecies

প্রোকেন—Procaine

ফন হায়ডেন—Von Hayden

ফ্যাগোসাইট—Phagocyte, রক্তের শ্বেতকণিকার মধ্যে যেগুলি বিকৃত-তন্তুকোষ, বিষবস্তু এবং ব্যাক্টিরিয়া বিনষ্ট করে।

ফ্লোরি—Florey

বায়ুজীবী—Aerobic, অবায়ুজীবী—Anaerobic

বিশোষণ—Absorption, শোষণ—Adsorption

বিষক্রিয়া—Toxity

বিষবস্তু—Pyrogen

ব্যাংস ডিজিজ—Bang's disease

ব্যাক্টিরিওফাজ—Bacteriophage, ব্যাক্টিরিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন তাদেরই নাশকারী বা জারণকারী বস্তু, এর মধ্যে অতি-সূক্ষ্ম জীবাণু থাকে।

ব্যাক্টিরিয়াল ফিল্টার—চিনামাটির সূক্ষ্ম ছাঁকন-যন্ত্র, এর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে জীবাণু গলে না।

ব্যাসিলাস—Bacillus, ক্ষুদ্র রড-এর আকারযুক্ত ব্যাক্‌টিরিয়ার শ্রেণীবিশেষ।

ব্যাসিলাস-ঘটিত—Bacillary

ব্যাসিলাস ব্রুসী—Bacillus Brucei

" ব্রেভিস— " Brevis

" শীগা— " Shigai

ভাইরাস—Virus, জীবাণুর চেয়ে সূক্ষ্মতর জীবনের প্রকাশ। একে সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একে আলাদা করা গেছে। উপযুক্ত মাধ্যমে জীবাণুর মতোই এ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। ইনফ্লুয়েনজা, টাইফাস, বসন্ত, হাম, জলাতঙ্ক ইত্যাদি এদের ক্রিয়ায় ঘটে। উদ্ভিদের অনেক রোগও এরা ঘটায়।

মাংসরস—Broth

মাধ্যম—Medium

মার্ক কোম্পানি—Merck Co.

মেথিলিন গ্লাইকল—Methylene glycol

মূত্রাশয় বা বস্তি—Bladder. Kidney—বৃক্ক

মেরুনালী—Spinal canal

রক্তমস্তু—Serum

রক্তরস—Plasma

রবার্ট কগ্‌হিল—Robert Coghill

রাইস্ট্রিক—Raistrick

রাওয়ে সহর—Rahway

রেণু—Spore (স্পোর)

রেনি ডুবস—Rene Dubos

রোগপ্রবণ—Sensitive



র‍্যাবিট ফিভার—Rabbit fever (*tularaemia*), কতকগুলি বন্য ক্ষুদ্র পশু এর ভাইরাস বহন করে।

লভেল—Lovell (একজন বিজ্ঞানী)

লাইকেন--Lichen, কোন কোন ছত্রক ও শৈবালের সমবায়।

লাইসোজাইম—Lysozyme, নানা উদ্ভিজ্জে এবং প্রাণি-নিঃস্রাবে বিদ্যমান মৃদু শাসক। রাসায়নিক প্রকৃতি অজ্ঞাত।

লিলি কোম্পানি—Lilly Co.

লেডারলে—Lederle

শক্তিনির্ণয়—Standardisation

শাসক বা জীবাণুশাসক—Antibiotic

শোষণ—Adsorption, সূক্ষ্ম গুঁড়া-বস্তুর মধ্যে দ্রবণ থেকে দ্রাব্য বস্তুর প্রবেশ। বিশোষণ—Absorption

সঞ্চরণ-ক্রিয়া—Diffusion

সাল্‌ফানিলএমাইড—Sulphanilamide

সিংগ্‌ল-সট প্রোডাক্ট—Single-shot product

সিলিণ্ডার-কাপ প্রণালী—Cylinder-cup method

সূচি-প্রয়োগ বা সূচিবেধ—Injection

সূত্রালি বা জালক—Mycelium, ছত্রকের দৃশ্যমান অংশ।

সেলমান এ. ওয়াক্‌সমান—Selman A. Waksman

স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়স—Staphylococcus aureus

স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াস—Streptomycis griseus

স্পোর—Spore, রেণু

স্বয়ংক্রিয়—Automatic

হিট্‌লি—Heatley

হিস্টামিন—Histamine, হিস্টিডিন নামক অ্যামিনো-অ্যাসিডের (অম্লের) বিকারে উৎপন্ন রক্তের চাপবর্ধক বিষবস্তু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

1. তড়িতের অভ্যুত্থান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
2. আমাদের খাদ্য : শ্রীনীলরতন ধর
3. ধরিত্রী : শ্রীসুকুমার বসু
4. হর্মোন : শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বিজ্ঞানপ্রবেশ

1. প্রারম্ভ : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
2. পদার্থবিদ্যা : পদার্থ ও শক্তি • শব্দ : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
3. পদার্থবিদ্যা : তাপ • আলো : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
4. পদার্থবিদ্যা : চুম্বক • তড়িৎ : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য